সমৃদ্ধ সংস্করণ
শিশু-কিশোরদের জন্য
সাহাবায়ে কেরামের
গল্প
মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

আলহামদুলিল্লাহ

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী 'সাহাবায়ে কেরামের গল্প' প্রকাশিত হলো। নির্ভরযোগ্য কয়েকটি কিতাবের সাহায্য নিয়ে গল্পগুলি তৈরি করা হয়েছে। সংকলনটি শিশুকিশোরদের উপযোগী ভাষায় প্রস্তুত করা হলেও এর আবেদন সববয়সী পাঠকদের জন্যে সমান বলে কোন কোন প্রবীণ লেখকবন্ধু মত প্রকাশ করেছেন। আসলে কাজটি কতটুকু কিংবা আদৌ কিছু হয়েছে কিনা তা বলতে পারেন পাঠক সমাজ। আমার জন্যে অবশ্য বই প্রকাশের মুহূর্তটি বড়ই আনন্দঘন। এ স্মরণীয় মুহূর্তে আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীমের দরবারে আমি পেশ করছি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ার সেজদা।

বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে গল্পগুলি লেখার সময় এমনকি পাণ্ডুলিপি নিয়ে ছোটাছুটির সময়ও বিষয়টি মনে জাগেনি। কিন্তু এখন মনে হয় আমি ভয় পাচ্ছি। ভীতি ও শংকায় মনের ভিতরে মনটা গুটিয়ে আসছে। সাহাবায়ে কেরামের মতো শ্রেষ্ঠতম আদর্শ একটি শ্রেণীকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি কোন অশোভনীয় আচরণ করে ফেলিনিতো! আল্লাহ ভালো জানেন, আমার কাজে কোন ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু আমার আবেগ ও নিষ্ঠায় কোন খাদ ছিলনা। বিজ্ঞ পাঠকের চোখে কোনরূপ অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমি যদি অবহিত হই তাহলে কৃতার্থ থাকবো। আল্লাহ্ আমাদের প্রয়াস কবুল করুন।

–শরীফ মুহাম্মদ
মোমেনশাহী

আম্মা

বেঁচে থাকলে যাঁর হাতে বইটি তুলে দিতাম

প্রথম প্রথম

তখন সময় ছিল কষ্টের। তখন সময় ছিল দুঃখের।

কাফেরদের অত্যাচারে সাহাবায়ে কেরাম জর্জরিত হয়ে যেতেন। রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতেন। গরম বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করতেন। তাঁদের শরীর থেকে রক্তের ধারা বয়ে যেত। দু'চোখ থেকে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়তো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

তবুও তাঁরা ইসলাম থেকে একচুল পরিমাণ সরে যেতে রাজী হতেন না। তাঁদের ঈমান আরো মযবুত হয়ে যেত। তাঁদের বিশ্বাস আরো পোক্ত হয়ে উঠতো। আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি তাঁদের মহব্বত আরো বেড়ে যেত।

ইসলাম প্রচারের একদম প্রথম যুগের কথা। একজন, দু'জন করে সবেমাত্র ত্রিশ-চল্লিশজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নিরবে-নিভৃতে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলামের দাওয়াত তখনো শুরু হয়নি।

সকল সাহাবী এই অবস্থাটাকে মেনে নিতে পারতেন না। কেউ কেউ নবীজীর দরবারে আবেদন জানালেন, "এবার আমরা ঘোষণা দিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।" মুসলমানের সংখ্যা যে খুবই কম নবীজী এই কথা সবাইকে বুঝালেন। সবাইকে বললেন– আরো কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করুক। আরেকটু শক্তি বাড়ুক, তারপর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলে ভালো হবে। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)ও যখন বারবার আব্দার জানালেন, প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের কথা নবীজীকে বললেন, তখন নবীজী অনুমতি দিয়ে দিলেন। সবাই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

একদিন।

সাহাবীগণ সবাই মসজিদে হারামের আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়লেন। মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতে লাগলেন। মসজিদে

হারামের চত্বরে, সাহাবী গণের সঙ্গে তাশরীফ নিয়ে আসলেন স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মসজিদে হারামের চত্বরে তখন কাফের সর্দারদের আড্ডা বসতো। মুশরেক কবিলা সর্দাররা সেখানে বসেই অনেক আচার-বিচার করতো। কোন কিছু হলে সবাই সেখানেই সমবেত হতো। হযরত রাসূলে করীম (রাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে এই চত্বরে দেখতে পেয়ে তারা কেউ কেউ সতর্ক হয়ে উঠলো। প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের দেব-দেবী, মূর্তীর বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারিত হলেই তাঁরা বাধা দিবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এসময় কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। বক্তৃতার মত করে তিনি সবাইকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের পথে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানালেন। দেব-দেবী, মূর্তী ছেড়ে এক মা'বুদ আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের দিকে সবাইকে ডাকলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই বেঁধে গেল হৈ-চৈ। কাফের গুন্ডারা এসে সাহাবীগণকে মারতে লাগল। চারিদিক থেকে এসে তারা মুসলমানদের উপর যেন ভেঙে পড়লো। আঘাতে আঘাতে বহু সাহাবী ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেন।

মারের চোটে হযরত আবু বকর (রাঃ) মাটিতে পড়ে গেলেন। কয়েকজন কাফের এসে তাঁকে চড়, লাথি, কিল, ঘুষি মারতে লাগল।

উৎবা ইবনে রবীআ' এক দাঙ্গাবাজ কাফের। ভীড়ের মধ্য থেকে এসে সে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সামনে দাঁড়ালো। তার পায়ে মোটা চামড়ার জুতা। সেই জুতা দিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মুখে আর পেটে সমানে লাথি মারতে শুরু করল। লাথির আঘাতে তাঁর সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। নাক আর মুখ হয়ে গেল একাকার। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মসজিদুল হারামের চত্বরে নিথর হয়ে পড়ে রইলো হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দেহ।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর গোত্রের লোকজন খবর পেয়ে ছুটে এলো। তাদের দেখে আক্রমণকারী কাফেররা সরে গেল। তারা একটি কাপড় দিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর রক্তাক্ত শরীরটা পেঁচিয়ে

বাড়ীতে নিয়ে এলো। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবারের সবাই আবু বকরের এই দশা দেখে আঁৎকে উঠলেন।

সবাই মিলে রক্তাক্ত আবু বকরের সেবা করতে লাগলেন। অজ্ঞান আবু বকরকে দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন, তিনি মারা গেছেন। আর কোনদিন তিনি কথা বলবেন না। সারা বেলা আবু বকর (রাঃ)-এর আব্বা তাঁকে ডাকলেন, জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু বেহুশ আবু বকর মুখ খুলে কোন কথারই জবাব দিতে পারলেন না।

সেইদিন সন্ধ্যায় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পূর্ণ হুঁশ ফিরে এলো। তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে সবাই তাঁর কথা শুনতে চাইলেন। শরীরের কোথাও কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা, কোন কিছু লাগবে কিনা-এসব জানার জন্য সবাই যখন উন্মুখ, তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বললেন-"রাসূলুল্লাহু (সাঃ) কেমন আছেন?"

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খান্দানের অনেকেই তখনো মুসলমান হননি। এই কথা শুনে কেউ কেউ বিরক্ত হলেন। অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ কেউ উঠে গেলেন। উম্মুখায়ের ছিলেন আবু বকর (রাঃ)-এর মা। মায়ের মন বড় নরম মন। তাঁর মা তাঁর পাশে বসলেন। বারবার খানা-পিনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মুখে একই কথা- "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এখন কেমন আছেন? তিনি কি নিরাপদ আছেন?"

মা বুঝতে পারলেন, রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দেখা করতে না পারলে তার সন্তানের প্রাণ ঠান্ডা হবে না। বহু কষ্ট করে রাতের অন্ধকারে দু'জনের কাঁধে ভর করে আবু বকর (রাঃ) নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

ক্ষত-বিক্ষত বন্ধু আবু বকর (রাঃ)-কে দেখে রাসূলে আকরাম (সাঃ) -এর অন্তর ব্যথিত হয়ে উথলে উঠলো। তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে জড়িয়ে ধরলেন। আবু বকর (রাঃ)-কে চুমু খেলেন।

প্রশান্তিতে ছেয়ে গেলো আবু বকর (রাঃ)-এর হৃদয়, মন, গোটা দেহ। কষ্টের কথা, আঘাতের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন।

একটি পরিবার

প্রথম ঈমান আনলেন একজন।

তিনি পরিবারের একজন নবীন যুবক। পরিবারের একজন ছেলে। আম্মার তাঁর নাম। তাঁর কাছ থেকেই দীক্ষা নিলেন মা-বাবা। এভাবে গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলো।

ইসলামের প্রথম যুগের একটি পরিবার। ইসলাম গ্রহণ করেছে কেউ, শুনলেই মক্কার মুশরিকরা মারমার করে তেড়ে আসে। তীর-ধনুক, বর্শা আর পাথর নিয়ে মুসলমানকে আঘাত করে, আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে তারপর ছাড়ে। এই পরিবারটি সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছে। দুনিয়া কাঁপানো কষ্ট ভোগ করেছে। অসম্ভব ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। ঈমান আর ইসলামের কাছে এই পরিবার নিজেদেরকে আমানত হিসেবে তুলে দিয়েছে। এই আমানত আর ভাঙা যায়নি।

একদিন। বহুদিনের মত একদিন।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে হযরত উসমান। একটি পাথুরে যমীনের কাছাকাছি এসে উভয়ে থেমে পড়লেন। দেখলেন, হযরত আম্মার (রাঃ)-কে, তাঁর আব্বা ইয়াসির (রাঃ)-কে, আম্মা সুমাইয়া (রাঃ)-কে খুঁটিতে বেঁধে রোদের তাপে নির্যাতন করছে কাফেররা। আর বারবার ইসলাম গ্রহণ ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। তাঁদের শরীর উদাম করে চাবুক দিয়ে পিটাচ্ছে কোরায়েশী নেতারা।

এদৃশ্য দেখে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর হৃদয়ে ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বিমর্ষ হয়ে গেলেন। তারপর দু'জনই এগিয়ে গেলেন তাঁদের দিকে। রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে দেখে আক্রান্ত ও নির্যাতিত গোটা পরিবার যেন

কান্নায় ভেঙে পড়লো। কাছের মানুষ পেলে মানুষের দুঃখ উথলে উঠে। আম্মারের আব্বা হযরত ইয়াসির (রাঃ) বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলেন– “ইয়া রাসূলাল্লাহ! সময় কি এভাবেই বয়ে যাবে?” ব্যথায় ব্যথায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বুকটা যেন ভেঙে পড়ছিলো। তিনি বললেন-“হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধরো! ধৈর্য ধরো!!” এরপর নবীজী তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দুআ’ করলেন।

কাফেররা রাসূলে করীম (সাঃ)-কে সেখানে দেখে মহা বিরক্ত হয়ে উঠছিল। তারা রাসূল (সাঃ)-কে সহ্য করতে পারছিল না। তারপরও রাসূলে আকরাম (সাঃ) বেদনা মাখানো গলায় আবার বললেন-“হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধরো! জান্নাতের অঙ্গীকার তো তোমাদেরই জন্যে।”

এরপর গোটা পরিবারের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চললো। অত্যাচার করতে করতে তাঁদের প্রায় বেহুঁশ করে ফেললো। কিন্তু কেউ নতি স্বীকার করলেন না। ইসলাম থেকে একবিন্দু পরিমাণও ছাড়লেন না তাঁরা।

পশুর মত জঘন্য অত্যাচারে মগ্ন হয়ে গেলো কাফেরের দল। আম্মারের আম্মা হযরত সুমাইয়া (রাঃ)-কে বেঁধে তাঁকে ধারালো বর্শা দিয়ে আঘাত করলো। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, ছেলের সামনে মাকে শহীদ করে দিল। ইসলামের শহীদদের খাতায় প্রথম নাম উঠলো হযরত সুমাইয়া (রাঃ)-এর।

কিন্তু এ দৃশ্য দেখেও অন্যরা টললেন না।

অসহ্য হয়ে কাফেররা হযরত ইয়াসির (রাঃ)-এর দুই পা দুই ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিল। ঘোড়া দুটিকে দু’দিকে ছুটিয়ে দিল। মর্মান্তিকভাবে শহীদ হলেন হযরত ইয়াসির (রাঃ)।

তারপর ইয়াসির (রাঃ)-এর আরেক ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কেও মারতে মারতে শহীদ করে ফেলা হলো।

অলৌকিকভাবে বেঁচে রইলেন হযরত আম্মার (রাঃ)।

ইসলামের জন্য মা-বাবা কুরবানী হয়ে গেলেন। কুরবানী হয়ে গেলেন ভাই। নিজের জীবনও শেষ হতে যাচ্ছিল। তবুও আম্মার (রাঃ) ইসলাম থেকে দূরে সরে যাননি। ইসলামের আরো কাছে এসেছেন!

গোটা পরিবারটাই আল্লাহ্‌র পথে উজাড় হয়ে গেছে। গোটা পরিবারটাই বেহেশতের পথে এগিয়ে গেছে।

ঘোষণা

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। ইসলামের একদম প্রথম যুগে ছিলেন মুসলমানদের জন্য ত্রাস। মুসলমানদের অনেকেই উমরকে ভয় পেতেন। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর উমর (রাঃ) হলেন মুসলমানদের বীর আর কাফেরদের জন্য ত্রাস। তখন কাফেরা উমর (রাঃ)-কে ভয় পেত।

উমর (রাঃ) যে কোন কাজ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করতেন। তাঁর মাঝে লুকানো ছাপা কোন ব্যাপারই ছিলনা। একদম পরিষ্কার মনের সাহসী মানুষ।

উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর একদিন। উপস্থিত লোকদেরকে উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন– "কুরায়শদের মাঝে এমন ব্যক্তি কে-যে বেশী বেশী একজনের কথা অন্যদের কে লাগিয়ে বেড়ায়?" কেউ একজন উত্তর দিলেন "জামিল ইবনে মি'মার।"

সকাল সকালই উমর (রাঃ) জামিলের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। জামিল উমর (রাঃ)-এর দিকে চোখ উঠিয়ে দেখলো। উমর (রাঃ) সময় নষ্ট না করে তাকে বললেন–জামিল! তুমি কি জান যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি? এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনে আমি প্রবেশ করেছি?

উমর (রাঃ)-এর কথা শুনে জামিল থমকে গেল। সে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থাকল কোন কথা বললোনা। তারপর গায়ের চাদরটা টেনে উঠে দাঁড়ালো। মসজিদে হারামের দিকে জামিল রওয়ানা দিল। উমর (রাঃ) তার পিছু পিছু হেঁটে চললেন। উমর (রাঃ) জানতেন, জামিলকে এই সংবাদ জানালে কী ফলাফল হবে। আরো দশজনের কাছে সংবাদটি বলার জন্য সে অস্থির হয়ে যাবে। এসব কিছু জেনে-শুনেই উমর (রাঃ) জামিলের বাড়ীতে এসেছেন।

কারণ, উমর (রাঃ) নিজেই এমন লোক খোঁজ করছিলেন, তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদটি যাকে জানালে সে সবার কাছে সংবাদটি পৌঁছে দিবে।

জামিল গিয়ে মসজিদে হারামের দরজায় দাঁড়ালো। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন উমর (রাঃ)! দরজায় দাঁড়িয়ে জামিল একটা হাঁক ছাড়লো–হে কোরাইশরা!

কোরাইশ নেতারা সব তখন মসজিদে হারামে বসে বিভিন্ন মজমা গুলজার করছিল। নিজেদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আড্ডা বাজী করছিল। জামিলের কথায় সবাই ঘুরে তাকালেন। দেখলো, দরজায় জামিল দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে উমর। তারা বুঝতে পারলো না, জামিল এখন নতুন আবার কী কথা সবাইকে শোনাবে?

জামিল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো-"তোমরা শুনে রাখো! উমর ইবনুল খাত্তাব বিধর্মী হয়ে গেছে।" হযরত উমর (রাঃ) তখনই জামিলের পিছনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করলেন-"জামিল মিথ্যা কথা বলেছে। আমি বিধর্মী হইনি। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত আর কেউ নেই এবং নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল।"

হযরত উমর (রাঃ)-এর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই হুলুস্থুল পড়ে গেলো। চারিদিক থেকে কোরায়শ যুবকরা ধেয়ে এলো। এলোপাথারি আক্রমণ করতে লাগলো উমর (রাঃ)-এর গায়ে। হযরত উমর (রাঃ)-ও থেমে থাকলেন না। তিনিও দু'হাতে তাদের সঙ্গে লড়তে লাগলেন।

সকাল থেকে হাতাহাতি, ধস্তাধস্তির এই যুদ্ধ চলতে লাগলো। সূর্য দুপুরে মাথার উপরে উঠে আসলো। বহুজনের সঙ্গে একজনের লড়াই। বহু হাতের সাথে উমর (রাঃ)-এর মাত্র দুটি হাত। কতক্ষণ আর পারা যায়। দুপুরে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন উমর (রাঃ)।

কাফের যুবকরা কোরায়েশের গুন্ডারা সব উমর (রাঃ)-এর মাথার কাছে এসে ভিড় করতে লাগলো। সবাই ভাবলো উমর এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর উচ্চবাচ্য করবেনা। তাকে তাড়িয়ে দিলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু মাথার কাছে কাফেরদেরকে ভিড় করতে দেখে আহত, ক্ষত-বিক্ষত উমর (রাঃ) আবারো গর্জে উঠলেন– "তোমাদের যা ইচ্ছা হয় এখন করতে পারো। কিন্তু মনে রাখবে-আমরা সংখ্যায় মাত্র তিনশ' পর্যন্তে পৌঁছে নেই, তারপর হয়তো এই মাটি তোমাদের জন্য আমরা ছেড়ে যাবো। আর তা নাহলে তোমরা আমাদের জন্য এই মাটি ছেড়ে যাবে।"

সাহসী উমর (রাঃ) আঘাত পেয়েও দমলেন না। দমবার পাত্র তিনি নন। কাফেরদেরকে সত্য আর মিথ্যার নতুন লড়াইয়ের ঘোষণা তিনি শুনিয়ে দিলেন ।

অনুতাপ

সারাক্ষণ তিনি ব্যস্ত থাকেন। তিনি ব্যস্ত থাকেন সাধারণ মানুষের জন্য। দেশের জন্য। জাতির জন্য। নিজের জন্য ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ তাঁর নেই। নিজের দিকে, নিজের পরিবারের সুখ-শান্তির দিকে চোখ উঠিয়ে তাকানোর সময়ই তো তিনি পাননা। খলীফা হওয়ার পর থেকে তাঁর একদন্ড ফুরসৎ নেই।

তিনি খলীফা হযরত উমর (রাঃ)।

খলীফা উমর (রাঃ) সাধারণ মানুষের খুব কাছের মানুষ। দরকার পড়লেই মানুষ খলীফার দুয়ারে হাজির হয়। খলীফা কান পেতে মানুষের কথা শুনেন। কারো প্রতি বিরক্ত হন না। কাউকে ফিরিয়ে দেন না। সাধারণ মানুষের কথাবার্তা শোনার জন্য তিনি নির্ধারিত সময় ঠিক করে রেখেছেন।

নির্ধারিত সময়ে দেশবাসী মুসলমানদের দুঃখের কথা, দরকারের কথা, অভাব-অভিযোগের কথা শুনে খলীফা নিরব বসে থাকেন না। তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রয়োজনীয় হুকুম জারি করেন। কাউকে শাস্তি দিতে হলে শাস্তি দেন। কারো অভাব থাকলে বায়তুল মাল থেকে তার হাতে খাবার তুলে দেন। কাউকে সান্ত্বনা দিতে হলে খলীফা নিজেই তাকে সান্ত্বনা দেন।

রাতের অন্ধকারেও পথে পথে ঘুরেন খলীফা। নিরবে নিভৃতে দেশবাসীর খোঁজ-খবর নেন। আর ভাবেন, কেউ কি অভাবী রয়ে গেলো?

কেউ কি কষ্টের মধ্যে দিন কাটালো? কারো প্রতি কোন অবিচার কি হয়ে গেলো? তাহলে তো দেশের যিম্মাদার হিসাবে আমি কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে পারবো না।

খলীফা একদিন এক জরুরী কাজে ব্যস্ত। খুব মনোযোগের সাথে সেই কাজটি করে যাচ্ছেন। অন্য কোন দিকে চোখ ফেলতে পারছেন না। হঠাৎ একলোক খলীফার সামনে এসে হাজির।

খলীফা যে তখন কত ব্যস্ত, লোকটি তা খেয়ালই করলো না। সময়-সুযোগ বুঝে কাজ করা দরকার, লোকটি তাও বুঝলো না। খলীফার কাজে বাধা দিয়েই লোকটি বলতে লাগলো-আমার কথা শুনুন খলীফা! অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে। তার নামে আমি আপনার কাছে বিচার দিতে এসেছি। তার জুলুমের বিচার চাই।

ঘুম থেকে হঠাৎ কাউকে জাগিয়ে দিলে সে প্রচন্ড বিরক্ত হয়। ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে এসে কাউকে বাধা দিলে তারও মাথা গরম হয়ে যায়। খলীফা সাংঘাতিক রেগে গেলেন। কারো অভিযোগ শোনার জন্য এখন তিনি বিলকুল প্রস্তুত ছিলেন না।

রাগে খলীফার মুখ লাল হয়ে গেলো। ভাবলেন, এতো আস্ত মূর্খ। সময়জ্ঞান বলতে নেই। আদব-লেহাজও শিখেনি। একে কিছুটা শিক্ষা দেয়া দরকার। খলীফা রাগী চোখে লোকটির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, তুমি কি জাননা, অভিযোগ শোনার জন্য আমি নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করি? তখন আসলে না কেন? যখন অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই, তখন এসে তুমি বিচার চাও!

খলীফার কন্ঠ থেকে যেন আগুনের টুকরা ঝরে পড়ছিলো। কথাটা শেষ করেই খলীফা পাশে রেখে দেয়া দোররাটা হাতে নিলেন এবং শপাং করে লোকটির গায়ে একটি আঘাত করলেন।

লোকটি তার অভিযোগ পেশ করার পরই বুঝেছিলো সে ভুল করে ফেলেছে। খলীফার চেহারা দেখে তার ধারণা আরো পোক্ত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর যখন খলীফা তার গায়ে দোররার আঘাত করলেন, তখন সে পরিষ্কার বুঝে গেলো, আজ তার বিচার পাওয়া যাবে না।

দোররার আঘাত গায়ে নিয়ে লোকটি খলীফার দরবার থেকে পথে নেমে পড়লো। লোকটির চোখ-মুখ তখন বড় বিষণ্ন।

এদিকে লোকটি যেই বিদায় নিলো, অমনি খলীফা অস্থির হয়ে গেলেন। একটু আগেই তিনি রেগে গিয়েছিলেন। এখন যেন তিনি লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাচ্ছেন। খলীফা মনে মনে ভাবলেন, একী করলেন তিনি! একজন ফরিয়াদীকে আঘাত করে ফিরিয়ে দিলেন? আল্লাহ্‌র কাছে তিনি কী জবাব দিবেন?

সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন। খলীফা হুকুম করে দিলেন লোকটিকে ধরে আনার জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লোকটিকে আবারো খলীফার সামনে হাজির করা হলো। না জানি খলীফা ফের কোন শাস্তি দেন, এই ভয়ে লোকটি দারুণ ভীত হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু খলীফার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটির ভয় কেটে গেলো। সে দেখলো, খলীফার মুখে রাগের কোন চিহ্ন নেই, ক্রোধের কোন ছাপ নেই। সে মুখে এখন অনুতাপের ছায়া। লজ্জা আর অনুশোচনার চিহ্ন!

খলীফা লোকটির হাতে দোররাটি তুলে দিলেন! তার পর অর্ধ দুনিয়ার শাসক খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রাঃ) কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন– ভাই' আমি তোমার উপর অবিচার করে ফেলেছি। মস্তবড় অপরাধ করেছি তোমাকে আঘাত করে। এখন তুমি এই দোররা দিয়ে আমার গায়ে আঘাত করো। প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

লোকটির তো আপাদ-মস্তক চমকে গেলো! খলীফার গায়ে আঘাত করে প্রতিশোধ নিতে বলছেন খলীফা নিজেই! একী হতে পারে! আমাদের নেতা! আমাদের কল্যাণ কামী। আমাদের মঙ্গলাকাঙ্খী। আমাদের জন্যই তো তাঁর জীবনটা তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁকে আঘাত করে প্রতিশোধ নিতে পারি!

মনের দিক থেকে লোকটি খলীফার প্রতি অনেক বেশী দুর্বল হয়ে গেলো। খলীফার এই আচরণে মুগ্ধ হয়ে প্রায় কেঁদে ফেললো। বললো, আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি আপনাকে মা'ফ করে দিলাম। প্রতিশোধ গ্রহণের আমার কোন প্রয়োজন নেই।

খলীফা সসম্মানে লোকটিকে বিদায় দিলেন।

আল্লাহ্‌র ভয়ে খলীফার হৃদয় তখনো কাঁপছে। তিনি তাঁর ঘরে এসে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর অশ্রুসজল চোখে নিজের অনুশোচনার জন্যে দীর্ঘক্ষণ বসে রইলেন। বসে বসে নিজেকেই নিজে ভর্ৎসনা করলেন– হে উমর! তুমি তো অধঃপতিত ছিলে, আল্লাহ তোমাকে উন্নত করেছেন। তুমি তো পথ হারা ছিলে, আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন। তুমি তো নগণ্য ছিলে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার মুসলমানদের বাদশাহ্ বানিয়েছেন। আজ তোমার কাছে এক নির্যাতিত লোক এসে জুলুমের প্রতিকার চাইলে তুমি তাকে আঘাত করে বসলে? আগামীকাল কেয়ামতের ময়দানে তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সামনে তুমি কি জবাব দিবে?

নিজেকে নিজে ধমকালেন। নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করলেন। আল্লাহ্‌র ভয়ে দীর্ঘক্ষণ খলীফা উমর (রাঃ) অশ্রুর স্রোতে ভাসতে লাগলেন।

ভয়

তাঁর নাম হযরত হানযালা (রাঃ)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, অগাধ শ্রদ্ধা, অগাধ ভালোবাসা।

ভালোবাসার টানে যখন তখন হানযালা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে ছুটে আসেন। ঈমান ও দ্বীনের আলোচনা শুনেন। রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি কথার একজন আগ্রহী শ্রোতা হানযালা (রাঃ)। রাসূলের দরবারে বসে কখনো অমনোযোগী থাকেননি তিনি।

গভীর মনোযোগে একদিন হানযালা (রাঃ) কথা শুনছেন। কথা বলছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। মনোযোগ দিয়ে তো হানযালা (রাঃ) কে শুনতেই হবে। ইহকালের অস্থায়ী জীবনের কথা, পরকালের স্থায়ী জিন্দেগির কথা, বেহেশত-দোযখের কথা শুনে শুনে হানযালা (রাঃ)-এর মন কোমল হয়ে গেলো। ভিজে গেলো তাঁর হৃদয়। দু'চোখ দিয়ে বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। জীবনের শেষ কথা কি হবে, মানুষের জীবনের কি মূল্য,

পরকালেরর সামনে ইহকালের গুরুত্ব কতটুকু–এসব ভেবে ভেবে হানযালা (রাঃ) নিঃশব্দে কাঁদতেই লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে হানযালা (রাঃ) সারাটা মুখ ভিজিয়ে ফেললেন।

মজলিস ভেঙে গেলে সবাই একে একে উঠে যায়। হানযালা (রাঃ)-ও এক সময় উঠে পড়লেন। তাঁর মন ভার হয়ে রইলো। গভীর চিন্তায় তিনি ডুবে রইলেন।

ঘরে এসে হানযালা (রাঃ) দেখলেন, বাচ্চারা খেলাধূলা করছে। তিনি এগিয়ে গেলেন। বাচ্চারা তাঁর সাথে এসে হাশি-খুশী, আনন্দের গল্প জুড়ে দিলো। হানযালা (রাঃ) বাচ্চাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন না। হেসে হেসে তিনিও তাদের সাথে আনন্দ করলেন।

স্ত্রী এসে সংসারের প্রয়োজনীয় কথা বললেন। হানযালা (রাঃ) স্ত্রীর কথা শুনলেন। নিজেও কথা বললেন। বিভিন্ন বিষয়ে দু'জনের মাঝে গল্প হতে হতে দু'জনই হাসতে লাগলেন। মন উজাড় করে দু'জনই উচ্ছল হয়ে উঠলেন।

স্ত্রী আর বাচ্চাদের মাঝে এসে হানযালা (রাঃ) প্রাণ খুলে আনন্দ করলেন। আনন্দ পেলেন। সুখী জীবনের স্বাদ লাভ করলেন।

হঠাৎ করেই আনন্দে ছেদ পড়লো। কি হলো, কি হলো? হানযালা (রাঃ) গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর চেহারায় গভীর পেরেশানী আর ভয়ের ছাপ ফুটে উঠলো।

ভয়ে ভয়ে যেন হানযালা (রাঃ) একেবারে কুঁকড়ে যাচ্ছেন। তাঁর হৃদয়ের ভিতরে একটি ভয় এসে ঢুকে পড়েছে। তিনি সত্যি সত্যি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন।

স্ত্রী, সন্তানরা কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। কৈ কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না, কেউ এসেও তো ভয় দেখালো না! হানযালা (রাঃ) তাহলে কাকে ভয় পাচ্ছেন? কাউকে কিছুই বুঝতে না দিয়েই হানযালা (রাঃ) ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

হানযালা (রাঃ) পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে। তিনি ভয়ংকর খারাপ হয়ে গেছেন। কেউ একজনকে বলতেই

হবে তাঁর মনের কথা। তা নাহলে নিস্তার নেই। ভিতরে ভিতরে মনের কামড়ে তিনি শেষ হয়ে যাবেন যে!

এই সময়েই পথ ধরে এগিয়ে এলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। আল্লাহ্‌র রাসূলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষ। আবু বকর (রাঃ) এসে একদম হানযালা (রাঃ)-এর মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে পেয়ে যেন হানযালা (রাঃ) একটা উপায় **অন্ততঃ পেয়ে গেলেন**। মনের সব জ্বালা আর অস্থিরতা এই মহান ব্যক্তিটির কাছে খুলে বললে অবশ্যই লাভ হবে-হানযালা (রাঃ) ভাবলেন।

হানযালা (রাঃ) দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন–ভাই আবু বকর ! হানযালা তো মোনাফেক হয়ে গেছে। হানযালা (রাঃ)-এর এই কথা শুনে আবু বকর (রাঃ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। হানযালা (রাঃ) তো আল্লাহর রাসূলের একজন প্রিয় সাহাবী। সে আবার মোনাফেক হয় কি করে! হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন-সুবহানাল্লাহ! তুমি এসব কী বলছো হানযালা? তুমি মোনাফেক হতে যাবে কেন? এতো কিছুতেই হতে পারে না।

হানযালা (রাঃ) তখন তাঁর মনের ভিতরের ভয়টা খুলে বললেন। বললেন, "হ্যাঁ ভাই আমি মোনাফেক হয়ে গেছি। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত থাকি এবং তাঁর মুখ থেকে বেহেশ্‌ত-দোযখের কথা শুনি, তখন আমার মনের অবস্থা এমন হয়, যেন আমার দু'চোখের সামনে বেহেশত ও দোযখ ভাসতে থাকে। আর যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সান্নিধ্য ছেড়ে ঘরে এসে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের মোহে আটকা পড়ি, তখন সেই সব কথা ভুলে যাই। মনের সেই অবস্থাটা আর থাকে না। আমার মনের অবস্থা যে দুই সময়ে দুই রকম হয়ে গেলো। আমি কি তাহলে মুনাফেক হয়ে গেলাম না।"

মোনাফেক বলে– ঈমানের ব্যাপারে সামনে এক রকম থাকলে আর আড়ালে আরেক রকম হয়ে গেলে। হানযালা (রাঃ)-এর জবাব শুনে আবু বকর (রাঃ)-ও ভয় পেয়ে গেলেন। দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তিনি বললেন, "আমারও তো একই অবস্থা। ঘরে এলে তো আমারও মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়।"

মানুষ ভয় পায় হিংস্র জীব-জন্তুকে। চোর-ডাকাত, খুনীকে। মানুষ ভয় পায় জীবন নাশ হওয়ার মত বিপদ-আপদকে। মনের ভিতরের অবস্থার পরিবর্তনে দুর্বল ঈমানদার মানুষ সামান্যতম ভয় পায় না। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রিয় দু'জন সাহাবী ভয় পেয়ে গেলেন মনের অবস্থার পরিবর্তনে। তাঁদের এই ভয় হয়ে গেলো যে, তাঁরা মোনাফেক হয়ে গেলেন কিনা। এই ভয়টা তাঁদের মাঝে আসতে পেরেছে এজন্যই যে, তাঁরা আল্লাহ্‌কে ভয় পেতেন।

অবশেষে দু'জনই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে এসে হাজির। দু'জনই ভয়ে কম্পমান। দুজনই প্রচন্ড অস্থির। হানযালা (রাঃ)-ই প্রথমে মুখ খুললেন। তাঁর ভয়ের কথা খুলে বললেন। নবীজীর দরবারে থাকলে তাঁর মনের যে অবস্থা হয় ঘরে গেলে সেই অবস্থাটা আর থাকে না, তিনি এটাও বললেন।

হানযালা (রাঃ) আরো বললেন যে, দু'মনের এই পবির্তনের কারণেই তিনি ভয় পাচ্ছেন যে, তিনি মোনাফেক হয়ে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সব শুনলেন। স্মিত হাসলেন। হানযালা (রাঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)-কে আশ্বস্ত করলেন। তারপর বললেন—যাঁর হাতে আমার জীবন সেই মহান আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলছি-আমার সামনে থাকলে তোমাদের মনে যে অবস্থা হয়, সব সময় সেই অবস্থা টিকে থাকলে ফেরেশ্‌তাগণ পথ-ঘাটে, ঘর-বাড়ীতে তোমাদের সঙ্গে মুছাফাহা করতো, হাত মিলাতো।

কিন্তু হে হানযালা! জেনে রেখো! আসল কথা হলো, মানুষের মন সব সময় এক রকম থাকে না। মন সব সময় একই রকম থাকবে এরকম আশাও করবে না। এরকম তো হয় ফেরেশতাদের মাঝে। তাদের মন বদলায় না। কারণ তাদের তো স্ত্রী, পুত্র, ঘর-সংসার নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।

ঈমান ঠিক থাকলে, ঈমান মজবুত থাকলে মনের এই সামান্য হেরফের হওয়ায় কেউ মোনাফেক হয়ে যায় না। ভয়ের কিছুই নেই।

সাহাবী দু'জনের মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেলো। কেটে গেলো দুশ্চিন্তার অন্ধকার। তাঁরা খুশীতে আপ্লুত হয়ে গেলেন। যাক বাঁচা গেলো!

নিরব

মাঝে মাঝে তিনি হেঁটে বেড়ান। এখান থেকে সেখানে, বাড়ী থেকে মসজিদে, মসজিদ থেকে বাড়ীতে। কখনো কখনো দ্বীনের কাজে যাচ্ছেন অন্য কোথাও। লোকজন তাঁকে দাওয়াত করে নিয়ে যায়। তিনি নিজ থেকেও খোঁজ-খবর নেন লোকজনের।

যেখানেই যান তিনি, তাঁর সঙ্গে একজন না একজন থাকেই। কারণ তিনি অন্ধ। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। চোখে রোগ ছিলো। বৃদ্ধ বয়সে চোখ দু'টির দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেছে। তারপরও তাঁকে চলাফেরা করতে হয়। দ্বীনের প্রয়োজনে, সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে।

তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই। কবিলার নেতা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ছেলে। কোরায়শরা তাঁকে মানে। মক্কার লোকেরা তাঁকে সমীহ করে। তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাথে সবাই পরিচিত।

মসজিদে হারামে এসে হাজির হলেন আব্বাস (রাঃ)। সঙ্গে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাঃ)। কোন একদিকে যাওয়ার পথে তাঁরা এখানে এসে হাজির হয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাঃ) মসজিদে হারামের যেখানে এসে দাঁড়ালেন, সামান্য দূর থেকে সেখানে হৈ হট্টগোল আর ঝগড়ার শব্দ ভেসে এলো। চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ দু'জনই শুনতে পেলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিছুতো দেখতে পেতেন না। কিন্তু ঝগড়ার শব্দ শুনে বড় বিরক্তবোধ করলেন। তাঁর চেহারা থমথমে হয়ে গেলো। তিনি কাউকে কিছুই বললেন না। শুধু সঙ্গী ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাঃ)-কে বললেন-আমাকে ঐ লোকগুলোর কাছে নিয়ে চলো।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন। জটলা পাকানো সেই লোকগুলোর মাঝে নিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে হাজির করলেন।

ঝগড়াটে লোকজন সব নিরব হয়ে গেলো। প্রবীণ সাহাবী এসে হাজির। জ্ঞানী, বিচক্ষণ একজন মানুষ এসে হাজির। তাঁর সামনে তো ঝগড়াঝাটি করা যায়না! সব খামোশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবাইকে সালাম দিলেন। লোকেরা সালামের জবাব দিলো। নিজেরা সবাই একটু নড়ে চড়ে দাঁড়ালো। তারপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বসতে অনুরোধ করলো।

বর্ষীয়ান ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের কথায় কান দিলেন না। জানিয়ে দিলেন, তিনি বসবেন না।

হযরত আব্বাস (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন– "তোমরা এতো হৈ চৈ করছো। তোমরা কি জাননা, আল্লাহ্‌র খাছ বান্দা কারা? আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা কারা? আল্লাহ্‌র খাছ বান্দা তো সেই সব মানুষ, যাঁরা আল্লাহ্‌র ভয়ে সব সময় খামোশ থাকেন, চুপ করে থাকেন। অথচ তাঁরা ভালো বলতে পারেন, ভালো লিখতে পারেন এবং বড় জ্ঞানী মানুষ। কিন্তু সেই সব বান্দাদের কেউই তো বোবা, অক্ষম নন।

আল্লাহ্‌র ভয়েই কেবল তাঁরা নিজেদের মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। তাঁদের মুখ থেকে একটি রা-ও বের হয় না অপ্রয়োজনে।" '

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ভারি স্বরে কথা বলছিলেন। উপস্থিত লোকদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলছিলেন, "আল্লাহ্‌র খাছ বান্দাগণ তো দিন-রাত শুধু আল্লাহ্ পাকের বড়ত্বের কথা ভাবেন। আল্লাহ্ পাক কতো মহান সেই কথাই চিন্তা করেন। আল্লাহ্‌র ভয় আর আল্লাহর বড়ত্বের ভাবনা তাঁদের উল্টা পাল্টা বুদ্ধির দৌড় খতম করে দিয়েছে।

আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের মন থাকে ভীত। মুখ থাকে বন্ধ। এ কারণেই তাঁরা সব সময় নেক কাজ করেন। ফালতু তর্ক-বিতর্কে, ঝগড়া-ঝাটিতে সময় খরচ করেন না। কিন্তু তোমরা তো তাঁদের থেকে বহু দূরে সরে গেছো।"

একটানা কথাগুলো বলে আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থামলেন। লোকজন সব যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেলো। তাদের মনের জগতে হঠাৎ যেন সূর্য উঠলো। তারা কেউ কোন কথা বললো না।

ঘটনার অনেক পরে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাঃ) বলেন-এরপর থেকে সেইসব লোকদের দু'জনকে কোনদিন একসঙ্গে বসে গল্প করতে দেখিনি।

অতিরিক্ত

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী। সকল সাহাবী তাঁকে মানেন। তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। রাসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর সবাই মিলে তাঁকে খলীফা মনোনীত করেছেন। মুসলিম উম্মার প্রধান ব্যক্তি তিনি।

খলীফা মানে মুসলমানদের বাদশাহ্। অথচ খলীফা হওয়ার পর তাঁর সকল আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, দেশ এবং জাতির ভালো-মন্দের প্রতি নজর রাখাই তাঁর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। একারণেই শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ তাঁকে অনুরোধ করেছেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার-বায়তুল মাল থেকে মাসিক একটি ভাতা গ্রহণ করার জন্য। তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন।

বায়তুল মাল থেকে সামান্য কিছু ভাতা তিনি প্রতিমাসে গ্রহণ করেন। টানাটানি করে কোনভাবে তাঁর সংসারের খরচ চলে যায় তাতে।

একবার খলীফ-পত্নীর ইচ্ছে হলো, কিছু মিষ্টি জাতীয় খাবার রান্না করে তিনি পরিবারের সবাইকে খাওয়াবেন। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো উপায় হয় না। এর জন্য অয়োজন করতে হয়। চিনি লাগে। ঘি লাগে। ময়দা লাগে। এসব কিছুরই ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিমাসে বায়তুল মাল থেকে সংসার খরচের জন্য যা পাওয়া যায়, তাতে রোজকার খাবার-দাবার কোন মতে চলে যায়। মিষ্টি রান্না করতে হলে এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু অর্থের প্রয়োজন।

সেই অতিরিক্ত অর্থের জোগান আর কে দেবে। খলীফার স্ত্রী সময়-সুযোগ বুঝে স্বামী আবু বকরের কানে একদিন কথাটা তুললেন-

ঃ একদিন সামান্য মিষ্টি রান্না করা ইচ্ছা করেছিলাম। কোন ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।

ঃ মিষ্টির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা আমার কাছে নেই।খলীফার সাব সাব জবাব।

খলীফার স্ত্রী বললেন-

ঃ বায়তুল মাল থেকে যা পাওয়া যায়, তা থেকে সঞ্চয় করে করে মিষ্টির ব্যবস্থা করা যাবে।

স্ত্রীর কথা শুনে খলীফা নিরব রইলেন।

এদিক খলীফার স্ত্রী প্রতিদিন সংসার খরচ থেকে একটু করে বাঁচাতে লাগলেন। টানাটানির সংসার বহু কষ্ট করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করলেন। এরপর মিষ্টির আয়োজন করার আগে সঞ্চয়ের বিষয়টি খলীফাকে একদিন জানালেন।

সাদামাটা এক ঘেয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে পরিবারের সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছে। মিষ্টির মত রুচিকর একটা কিছু এবার সবার জন্যই ব্যবস্থা করা যাবে। সুস্বাদু খাবার খেয়ে সবাই খুশী হবে। এরকম ভাবতে ভাবতে খলীফার স্ত্রীর মন খুশীতে ভরে গেলো। তিনি খলীফাকে আনন্দেই সংবাদটি দিলেন।

কিন্তু খলীফা এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। এরপর বায়তুল মালে খবর পাঠালেন তিনি। বায়তুল মালের লোক খলীফার বাড়ীতে এসে হাজির হলো। খলীফা–পত্নী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, খলীফা তাঁর সঞ্চিত অর্থ বায়তুল মালের লোকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। খলীফা-পত্নী ভাবতেই পারেন নি যে, এতদিন ধরে জমা করা, কষ্ট করে করে সঞ্চয় করা সামান্য অর্থ খলীফা বায়তুল মালে তুলে দিবেন।

বায়তুল মালে সঞ্চিত অর্থ জমা দিয়ে খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন-এই সঞ্চয়ের ঘটনায় প্রমাণ হলো যে, এ পরিমাণ অর্থ বায়তুল মাল থেকে না তুললেও আমার সংসারের খাবার খরচ চলে যাবে। এ কারণেই এই অর্থটুকু অতিরিক্ত। অতিরিক্ত সম্পদ আমি কিছুতেই বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করতে পারি না।

রাজা- বাদশাহদের কোন অভাব থাকে না। অভাব -অনটন তাদের ছুঁতেই পারে না। সিন্দুকে থাকে কাড়ি কাড়ি টাকা। দামি আলমিরায় থরে থরে সাজানো থাকে হাজার রকম পোশাক। আর সুস্বাদু খাবার-দাবারে

তো ঘর বোঝাই থাকে। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে চাকর-বাকরদের হুকুম দিলেই হলো; সঙ্গে সঙ্গে তা হাজির হয়ে যায়।

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের ধারাই এমন। এর উল্টো হতে কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূলের সাহাবীগণ সব কিছুই উল্টে-পাল্টে দিয়েছেন। তাঁদের দু'চোখের সামনে ছিলো আখেরাত। তাঁরা সংযম আর দারিদ্রের মধ্যেই নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে তুলেছেন।

অতিরিক্ত কোন কিছু তাঁরা ঘরে রাখতে চাইতেন না। অতিরিক্ত কোন সম্পদ তাঁরা বায়তুল মাল থেকে তুলতেন না। যত কষ্টই হোক, যত অনটনই থাকুক তাঁরা এ নিয়ম ভাঙেন নি।

বাদশাহ হওয়ার পর, খলীফা হওয়ার পর এই নিয়ম আরো কড়াকড়ি ভাবেই তাঁরা মনতেন।

খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দকি (রাঃ) হিসাবে কষলেন। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণটুকুকে অতিরিক্ত হিসাবে চিহ্নিত করলেন। তারপর সব সময়ের জন্যই সেই অর্থ নিজের জন্য বরাদ্দ করা বাতিল করে দিলেন।

দুধের পেয়ালা

মানুষ চলাচলের পথ। সে পথ দিয়ে সবই আসা-যাওয়া করে। পথে কেউ বসে থাকে না। পথ বসে থাকার জায়গা নয়। বসে বিশ্রাম করার জন্য সবাই একটু জায়গা খুঁজছে।

কিন্তু আবু হুরায়রা (রাঃ) একদিন পথেই বসে পড়লেন। পথে তো তার কেউ সখ করে বসেনা। তিনিও সখ করে বসেননি।

এ পথ দিয়ে চলাফেরা করেন সাহাবীগণ। এ পথে চলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত আবু হুরায়রা পরিচিত সবার চলাচলের এই পথেই বসলেন। বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক বেলা খেতে না পেয়ে ক্ষুধায় কাতর হয়ে গেছেন তিনি। কাউকে কিছু বলতে পারছেন না। পথে বসে অপেক্ষা করছেন, যদি কেউ তাঁকে দেখে তাঁর অবস্থাটা বুঝে নেয়; তাহলেই হয়ে

যায়। যিনি বুঝবেন তিনি নিশ্চয়ই আবু হুরায়রাকে নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যাবেন। এক বেলা খাবারের ব্যবস্থাতো হয়ে যাবে!

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) একজন বিশিষ্ট সাহাবী। কিন্তু এক সময় তাঁর অবস্থা এমন কেটেছে। ক্ষুধায় ক্ষুধায় পাগলের মত হয়ে যেতেন। খেতে না পেয়ে পেয়ে মাটিতে গড়া গড়ি খেতেন। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতেন না। সবাই ভাবতেন আবু হুরায়রার অসুখ করেছে। সেদিনও ক্ষুধার জ্বালায় আবু হুরায়রা পথে বসে পড়েছিলেন।

আবু হুরায়রা বসে আছেন তো বসেই আছেন। অনেকক্ষণ যাবৎ সে পথ দিয়ে কেউ আসছে না। হঠাৎ দেখা গেল আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আসছেন। আবু হুরায়রা ভিতরে ভিতরে খুশী হয়ে উঠলেন। আবু বকর তার দিকে ভালোভাবে নজর দিলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারেবেন।

আবু বকর সামনে আসতেই আবু হুরায়রা সালাম দিলেন। আবু বকর সালামের জবাব দিলেন। দু'জনের মাঝে সামান্য কয়েকটি কথাবার্তাও হলো। কিন্তু আবু বকর কিছু বুঝতেই পারলেন না। পথ ধরে এগিয়ে গেলেন।

এমনিতেই ক্ষুধায় কাতর। এবার আরো দমে গেলেন আবু হুরায়রা (রাঃ)। কিছুক্ষণ পরেই এ পথে এগিয়ে এলেন হযরত ওমর (রাঃ)। আবু হুরায়রা আবারো উৎসাহী হয়ে উঠলেন। দু'জনের সালাম বিনিময় হলো। টুক টাক কথাবার্তা হলো। ওমর আর দেরি করলেন না। তিনিও চলে গেলেন।

ক্ষুধার্ত আবু হুরায়রা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেলেন। ক্ষুধার জ্বালা তিনি কাউকে বুঝাতেই পারছেন না। ক্ষুধার কষ্ট, একদিন দু'দিন কিছুই না খেয়ে কষ্ট তাঁর সহ্য হয়ে গেছে। মসজিদে নববীর একপাশে কাত হয়ে রাত পার করে দেন। সারাটা বেলা রাসূলে করীম(সাঃ)-এর পিছু পিছু ঘুরেন। নবীজীর মুখ থেকে যখন যা শুনেন মুখস্থ করে ফেলেন।

জীবিকার সন্ধানে ঘুরার সুযোগই তিনি পাননা। হযরত ওমর চলে যাবার পর আবু হুরায়রা কিছুটা হতাশই হয়ে পড়েছিলেন। তারপরও অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত এ পথ ধরে এগিয়ে এলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। আবু হুরায়রা বুক বেঁধে বসে রইলেন। রাসূলুল্লাহ কাছাকাছি আসতেই আবু

হুরায়রা সালাম দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সালামের জবাব দিলেন। তারপর পথে বসে থাকা আবু হুরায়রার মুখের দিকে গভীর চোখে তাকালেন।

মা যেমন সন্তানের মুখের দিকে তাকালেই সন্তানের কষ্ট বুঝে নিতে পারেন,রাসূলুল্লাহও তেমনি বুঝে নিলেন আবু হুরায়রার কষ্ট।

আবু হুরায়রার দিকে তাকিয়ে তিনি স্মিত হাসলেন। অভয়ের হাসি। আশ্বাসের হাসি। এরপর বললেন-আবু হুরায়রা! উঠো, আমার সাথে চলো।

ক্ষুধার্ত আবু হুরায়রার পেট খাদ্যের অভাবে খালী হয়ে আছে; কিন্তু তাঁর বুক আনন্দে ভরাট হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহর একটি স্মিত হাসি যেন তাঁর কষ্টের কালি ধুয়ে সাফ করে দিয়েছে।

আবু হুরায়রা নবীজীর সাথে বাড়িতে এলেন। ভিতর থেকে এক পেয়ালা দুধ নবীজীর সামনে হাজির করা হলো। নবীজী আবু হুরায়রাকে তাঁর সব সঙ্গী-সাথীদের ডেকে আনতে বললেন।

মসজিদে নব্বীর পাশে হযরত আবু হুরায়রার মত আরো প্রায় সত্তরজন সাহাবী থাকতেন। এঁদের সবারই পরিচয় হলো আছহাবে ছুফ্‌ফা। আবু হুরায়রা বড় বিষণ্ন মনে সবাইকে ডাকতে গেলেন।

এক পেয়ালা দুধ। পেট ভরে পান করতে চাইলে তো একজনেরই হবে না। সেই দুধ পান করবে সত্তর-বাহাত্তজন! কী অবস্থা যে হবে! ভাবতে ভাবতে আবু হুরায়রা অস্থির হয়ে উঠেছেন।

আবু হুরায়রা সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। সবাইকে একসঙ্গে বসানো হলো। সবাইকে এবার দুধের পেয়ালা এগিয়ে দিতে হবে আবু হুরায়রাকেই। আবু হুরায়রা এক রকম নিশ্চিত হয়ে গেলেন। তাঁর আশায় গুড়েবালি পড়ে গেছে। আজকে তাঁর কোন হিল্লে হবে না। তাঁকে দুধ পান না করেই থাকতে হবে। কিন্তু কিছুই করার নেই। রাসূলুল্লাহ্‌র হুকুম।

আবু হুরায়রা একজন করে প্রত্যেকের সামনে পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। সবাই পেয়ালায় চুমুক দিয়ে দুধ পান করলেন। সবাই জানালেন, তাঁরা তৃপ্ত হয়ে দুধ পান করেছেন।

আবু হুরায়রা তাজ্জব বনে গেলেন। এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে!

সবাইকে দুধ পান করানো শেষ হলে আবু হুরায়রা পেয়ালাটি নবীজীর হাতে তুলে দিলেন।

এবার নবীজী আবু হুরায়রার মুখের দিকে আবারো গভীরভাবে তাকালেন এবং মৃদ হাসলেন। তারপর বললেন–আবু হুরায়রা,এখন শুধু তোমার আর আমার পালা।

সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া হয়ে আবু হুরায়রা বললেন- নিঃসন্দেহে হুজুর! আপনি আর আমি বাকী রয়ে গেছি।

মৃদ হেসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পেয়ালাটি আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর হাতে তুলে দিলেন। আবু হুরায়রা আর দেরি করলেন না। পেয়ালায় চুমুক দিলেন। দীর্ঘ চুমুক। কিন্তু দুধ শেষ হলো না!

তিনি মুখ তুললেন। নবীজী বললেন-আবারো পান করো।

আবু হুরায়রা আবারো পেয়ালায় মুখ রাখলেন এবং দুধ পান করলেন।

এরপর আবারো দুধ পানের নির্দেশ হলো। কিন্তু ক্ষুধার্ত আবু হুরায়রা এবার এতটাই তৃপ্ত হয়ে গেলেন যে, আর সামান্য দুধ পান করতেও অপারগ হয়ে গেলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধ পান করলেন। পেয়ালার দুধ ফুরিয়ে গেলো।

এক পেয়ালা দুধ ক্ষুধার্ত আবু হুরায়রার ক্ষুধা মিটালো। ক্ষুধা মিটালো আরো সত্তরজন আছহাবে ছুফফার। সেই দুধ শেষ পর্যন্ত স্বয়ং নবীজীও পান করলেন।

ক্ষুধায় ক্ষুধায় অসুস্থ হয়ে যাওয়া মানুষ , মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া মানুষ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এই বিস্ময়কর ঘটনাটি দেখে বড় তৃপ্তিবোধ করলেন।

সুপারিশ

পরামর্শ সভা বসলো চারজনের। চারজন বিশিষ্ট সাহাবী পরামর্শে বসেছেন হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ) এবং হযরত তালহা (রাঃ)।

খলীফার ভাতা বাড়ানো দরকার। খলীফা প্রতিমাসে বায়তুল মাল থেকে যে ভাতা পান, সেই ভাতায় তাঁকে সংসার চালাতে হয়। সংসারের যাবতীয় খরচের উৎস সেই ভাতাই। এর বাইরে খলীফার কোন আয় নেই। কিন্তু নির্ধারিত ভাতা দিয়ে সংসার চালাতে খলীফার কষ্ট হচ্ছে। টানাটানি করতে হচ্ছে।

মুসলিম জাহানের খলীফা তখন হযরত উমর (রাঃ)। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি খলীফা মনোনীত হয়েছেন।

খলীফা উমর তাঁর কষ্টের কথা কাউকে বলেননি। তাঁর ভাতা বাড়ানো দরকার কিনা,এই ভাবনাও তিনি ভাবেননি। কিন্তু সাহাবীগণ সব লক্ষ্য করেছেন। খলীফার সংসারে দারিদ্র দেখে সাহাবীগণ নিজেরা কষ্ট অনুভব করেছেন।

বিশিষ্ট চার সাহাবী পরামর্শ করলেন। তাঁরা সাব্যস্ত করলেন, খলীফার ভাতা বাড়াতে খলীফাকে তাঁরাই অনুরোধ করবেন। খলীফা তো আর নিজে সুবিধা-অসুবিধা কিছুই দেখেন না। তাঁর ভাবনা জনগণকে নিয়ে। মুসলিম জাতিকে নিয়ে। কিভাবে দেশের কল্যাণ হয়, কিভাবে জাতির কল্যাণ হয় সেদিকেই তাঁর নজর।

দিন নেই, রাত নেই পথে পথে ঘুরে খলীফা খোঁজ নেন,কোন মানুষের কষ্ট হচ্ছে কিনা। কোন মানুষ ক্ষুধার্ত রইলো কিনা। সেই খলীফা নিজের ঘরের কষ্টের দিকে নজর দিবেন কখন!

চার সাহাবী সাব্যস্ত করলেন, খলীফাকে তাঁরা অনুরোধ করবেন। কিন্তু কেউ সাহস পাচ্ছেন না। খলীফার মুখোমখি হয়ে খলীফার ভাতা বাড়াতে অনুরোধ জানাতে সবাই ভয় পাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঠিক করলেন, একজন কাউকে দিয়ে সুপারিশ করাতে হবে। এমন একজন ,যাঁর উপর খলীফা রাগ করতে পারবেন না।

হযরত হাফছা (রাঃ) খলীফা উমরের খুব প্রিয় মানুষ। একদিকে তিনি খলিফার কন্যা। আরেকদিকে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সহধর্মিনী।

হযরত হাফছার কাছে চার সাহাবী এলেন। সবকিছু খুলে বললেন। তবে খলীফার কাছে তাঁদের নাম না বলার জন্য হাফছা (রাঃ)-কে তাঁরা অনুরোধ করলেন। হাফছা সুপারিশ করতে রাজী হলেন।

নিজের কাজ হাসিলের জন্য মানুষ সুপারিশের লোক খোঁজে। সুপারিশ না হলে কাজ হবে না। মস্তবড় সুপারিশ ধরার জন্য হন্যে হয়ে মানুষ রাত-দিন ঘুরে। দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দেয়। অন্যের ভাবনা কে ভাবে।

কী আশ্চার্য ! এখানে যার প্রয়োজন,যার কষ্ট তাঁর কোন কথা নেই। তাঁর কোন চেষ্টা নেই। উল্টো তাঁর কাজটি করার জন্য তাঁর কাছেই অন্যদের সুপারিশ করতে হচ্ছে।

এমন ঘটনা কেউ কখনো দেখেছে?

এমন ভাবনা কেউ কখনো ভেবেছে?

মানুষ সচরাচর যা দেখে না, মানুষ সচরাচর যা ভাবে না, রাসূলের এক-একজন সাহাবী তা-ই বাস্তব করে তুলেছেন।

হযরত হাফছা (রাঃ) খলীফার মেজাজ-মর্জি বুঝে একদিন ভাতা বাড়ানোর প্রসঙ্গটি তুললেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর অনুরোধের কথা খলীফাকে জানালেন। কারো নাম উল্লেখ করেলেন না।

হাফছার কথা শুনে খলীফার মুখ অন্ধকার হয়ে গেলো। খলীফার চেহারায় রাগের ছাপ, ক্রোধের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। খলীফা রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,কে কে আমার কাছে এই কথা বলার জন্য তোমাকে বলেছে?

ঃ আব্বা! আগে আপনার মতামত জানতে চাই। হাফছা কারো নাম উল্লেখ করলেন না।

খলীফা রেগে-মেগে বললেন-" তাদের নাম জানতে পারলে আমি তাদের উচিত শিক্ষা দিতাম।"

খলীফার কন্যা হাফছা বুঝে গেলেন তাঁর সুপারিশ আর কাজ হবে না। এখন তিনি উঠতে পারলেই বাঁচেন। কিন্তু খলীফা তাঁকে ছাড়লেন না। উঠতে দিলেন না।

হাফছা দেখলেন, কিছুটা রাগত আর কিছুটা বিষণ্ন স্বরে খলীফা উমর (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করেছেন-বলো তো হাফছা! বলোতো মা আমার!! তোমার ঘরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সবচেয়ে ভালো পোশাকটা কেমন ছিলো?

ঃ রাসূলুল্লাহ্‌র ব্যবহারের জন্য আমার ঘরে মাত্র দুইটি হলুদ রঙের কাপড় ছিলো। জুমার দিনে আর বিদেশী কোন মেহ্‌মান সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি কাপড়গুলো পরে বের হতেন।

ঃ বলো তো, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবচেয়ে ভালো খাবার কি খেতেন?

ঃ আমরা যবের রুটি খেতাম। একদিন ঘির পাত্রে যে তলানিটুকু ছিলো, তা গরম রুটিতে লাগিয়ে লাগিয়ে আমরা খেয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও তা খেয়েছিলেন। উপস্থিত অন্যদেরও তা খেতে দিয়েছিলেন।

ঃ তোমার ঘরে সবচেয়ে ভালো বিছানাটা কেমন ছিলো?

ঃ বিছানার জন্য একটি মোটা কাপড় ছিলো। গরমের সময় কাপড়টি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম। শীতকালে অর্ধেকটুকু বিছিয়ে দিতাম। আর বাকী অর্ধেক দিয়ে আমরা শরীর ঢাকতাম।

এসব প্রশ্নোত্তরের পর খলীফা উমর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর চেহারায় প্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যেন তিনি একটা কিছু চাইছিলেন। সেটা পেয়ে গেছেন।

এরপর তিনি আত্মবিশ্বাসের সুরে বললেন-হাফছা! যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, এবার তুমি গিয়ে তাদের জানিয়ে দাও, আমি রাসূলে করীম (সাঃ) -এর আদর্শ অনুসরণ করে চলতে চাই। তিনি একটি উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। আখেরাতের উপর তিনি ভরসা করতেন। আমিও তাঁরই অনুসরণ করবো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে জীবন যাপন করছেন, আবু বকর (রাঃ) তা অনুসরণ করেছেন। প্রথমজনের পথে দ্বিতীয়জন চলেছেন। আমি হলাম তৃতীয় ব্যক্তি। আমিও সেই পথে যাত্রা শুরু করেছি। যদি তাঁদের পথে চলতে পারি, তবে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে আমিও মিলিত হতে পারবো। আর যদি তাঁদের সরল-সাদাসিধা জীবন আমি ছেড়ে দেই, ভোগ-বিলাস বাড়িয়ে দেই, তাহলে কিছুতেই আমি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো না।

আমাকে আমার ভাতা বাড়ানোর সুপারিশ করে তো লাভ নেই। আমি আমার আগের দু'জনের পথ ছাড়বো না।

আধা দুনিয়ার শাসক খলীফা উমর (রাঃ)। তাঁর বিস্ময়কর এই সংযমের কথা শুনে হাফছা থমকে গেলেন। এক সময় তিনি উঠে পড়লেন।

বীর রাখাল

পেশায় তিনি ছিলেন একজন রাখাল।

মদীনার এক গ্রামে থাকেন। সরল সাদাসিধা জীবন। তেমন পরিচিত কেউ নন। সবাই তাঁকে ভালো করে চিনেও না। বড় বড় কাজে অন্যদের যেমন ডাক পড়ে, তেমনভাবে তাঁকে খোঁজও করা হয় না।

দিনের বেলায় ছাগল চরান। সামান্য ফসলের জমি চাষবাস করেন। দূরে পাহাড়ী ঢালে, মাঠে-প্রান্তরে যাতায়াত করেন। তাঁর সাথে থাকে একপাল ছাগল। কখনো কখনো সেই ছাগলের রশি হাতে নিয়েই দিন পার করে দেন। কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। হৈ-হট্টগোল ঝামেলা থেকে দূরে দূরেই থাকেন।

তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর একজন সাহাবী। তাঁর নাম ওহাব ইবনে কাবুস। ওহাব ইবনে কাবুস (রাঃ) এভাবেই তাঁর সরল জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন।

উহুদ যুদ্ধের দিন।

ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়েছেন ওহাব (রাঃ)। তাঁর সঙ্গে একপাল ছাগল। একটি রশিতে ছাগলগুলো বাঁধা। মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন তিনি। মদীনা শহরের কাছাকাছি একটি মাঠে ছাগলগুলো চরাবেন, এটাই তাঁর ইচ্ছা। উহুদ প্রান্তরে যে যুদ্ধ হচ্ছে, এ সম্পর্কে তিনি জানেন না।

ছাগলের পাল নিয়ে ওহাব (রাঃ) যখন মদীনায় এসে পৌঁছলেন, তখন মদীনা শহরে থমথমে ভাব। লোকজন কম। পথ-ঘাট ফাঁকা। তাঁর মনে সন্দেহ জাগলো, সবাই মিলে কোথাও চলে গেলেন নাকি? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজেও কি কোথাও চলে গেলেন ?

ওহাব ইবনে কাবুস (রাঃ) পথে একজনকে পেয়েছিলেন। মনের ভাবনাটা তাঁকে বলেই ফেললেন–ভাই! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এখন কোথায় বলতে পারেন?

ঃ সাহাবীগণ-কে সঙ্গে নিয়ে রাসূলে করীম (সাঃ) উহুদ প্রান্তরে গিয়েছেন। সেখানে মুশরিকদের সাথে আজ মুসলমানদের যুদ্ধ হবে।

ওহাব (রাঃ) আর দেরি করতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধে চলে গেছেন আর তিনি মদীনায় বসে বসে ছাগল চরাবেন, এটা তিনি ভাবতেই পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই উহুদের দিকে রওয়ানা দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওহাব (রাঃ) উহুদ প্রান্তরের পাশে হাজির হলেন। দেখলেন হাজার খানেক সাহাবী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছেন। যুদ্ধের তখন এক কঠিন অবস্থা। মুসলমানদেরকে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ করে ফেলেছে। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ওহাব নিজেও প্রান্তরে ঢুকে পড়লেন। দূরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলেন। রাসূলের খুব কাছে পৌঁছে গেলেন তিনি।

ঠিক এই মুহূর্তে একদল কাফের মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে করতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে এল। কাফেরদের মতলব ভয়ংকর। তারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর আক্রমণ করতে চায়। মুসলমানদের কাউকে শহীদ করে দিয়ে আর কাউকে আহত করে কাফেররা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

কাফেরদের এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে ওহাব (রাঃ) ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "যে ব্যক্তি এই কাফেরদের কে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে, বেহেশ্‌তে সে আমার সাথী হবে।"

রাসূলের কথা শেষ হতেই ওহাব (রাঃ) যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। খোলা তলোয়ার হাতে আল্লাহ্‌র রাসূলের শত্রুদের ধাওয়া করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাফেরদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

কাফেররা আরো দু'বার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে এসেছিল। সেই দু'বারও ওহাব (রাঃ) তাদের ধাওয়া করে সরিয়ে দিলেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল (রাঃ) দারুণ খুশী হলেন। ওহাব (রাঃ)-কে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ শোনালেন।

বেহেশ্‌তের সুসংবাদ পেয়ে ওহাব (রাঃ) খুশীতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। একেবারে সোজা শত্রুদের মাঝে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। যুদ্ধ করতে

লাগলেন। অসম সাহসী বীরের মত যুদ্ধ করে অনেক কাফের ধরাশায়ী করে দিলেন। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় ওহাব ইবনে কাবুস (রাঃ) নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো, রাখাল ওহাব এক মহান বীরের মত শুয়ে আছেন রক্তের গালিচায়।

সাহসী বীর ওহাব (রাঃ)-এর মাথার কাছে রাসূলে করীম (সাঃ) এসে দাঁড়ালেন। কান্না মাখানো গলায় বললেন-ওহাব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

ওহাব (রাঃ)-কে দাফন করলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। দীনের পথে এ বীর শহীদের মর্যাদা উপলব্ধি করলেন সব সাহাবী।

দুই কিশোর

বদরের ময়দান।

একদিকে মুসলমান। আরেক দিকে কাফের। মুসলমানদের দলে আছেন স্বয়ং রাসূলে করীম (সাঃ)। আরো আছেন সাহাবীগণ। কাফেরদের দলে রয়েছে মক্কার বড় বড় কাফের সর্দার। বহুদিন পর্যন্ত যেসব কাফের মক্কায় মুসলমানদের কষ্ট দিয়েছে, নির্যাতন করেছে, রাসূল (সাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা করেছে, তাদের অনেকেই এই যুদ্ধে এসেছে। বদর যুদ্ধ হলো কাফেরদের সাথে মুসলমানদের প্রথম প্রকাশ্য জিহাদ।

তুমুল যুদ্ধ চলছে। চারিদিকে শত্রুকে খুঁজে চলেছে সবাই। কেউ কারো দিকে নজর দিতে পারছেনা। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, শত্রুকে কিভাবে ঘায়েল করা যায়। হঠাৎ দেখলেন, তাঁর দু'পাশে এসে দাঁড়ালো দুটি বালক। দু'জনই মুসলিম।

আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) বালক দু'জনের দিকে তাকালেন। মনে মনে তিনি হতাশ হলেন। এরা তো নিতান্তই বালক! এরা যুদ্ধ করবে কিভাবে! তিনি ভাবছিলেন, যদি তাঁর আশে-পাশে আরো শক্তসমর্থ

মুসলমান থাকতেন, তাহলে কাফেরদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর সময় একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করতে পারতেন; কিন্তু সেই কাজ কি এই বালক দু'জনকে দিয়ে সম্ভব?

বালক দু'জন সম্পর্কে তিনি যখন এ ধরনের ভাবনা ভাবছিলেন, তখনই এক বালক এসে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলো। তারপর বল- চাচাজান! আপনি আবু জেহেল কে চিনেন?

আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ জবাবে বললেন-হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু আবু জেহেলকে তোমার কী প্রয়োজন?'

সেই বালক বললো-"আমরা শুনেছি, আবু জেহেল আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-কে গালা গালি করে। নবীজীর নামে আজে-বাজে কথাবার্তা বলে বেড়ায়। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আবু জেহেলকে দেখতে পাই, তবে তার জীবন খতম করার আগে আমি ক্ষ্যান্ত হবো না। যদি তাকে খতম করতে না পারি তবে নিজেই শহীদ হয়ে যাবো।"

বালকের কথা শুনে আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) অবাক হয়ে গেলেন। অল্প বয়সী বালক! অথচ কী অসামান্য সাহস!

এসময়েই অপর বালকটিও তাঁকে জিজ্ঞাসা করল– আবু জেহেল কে, কোথায় পাওয়া যাবে, জানতে চাইলো। আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) তাঁকেও প্রশ্ন করলেন–"আবু জেহেলকে তোমার কী প্রয়োজন?"-এই বালকটিও আগের বালকের মতই জবাব দিল। আবু জেহেলকে যেখানেই পাওয়া যাক, তাকে হত্যা করবোই, এই প্রত্যয় ব্যক্ত করল।

পাশে দাঁড়ানো দুই কিশোরের কথায় আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) যখন বিস্মিত হচ্ছিলেন; অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই দেখলেন, যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে আবু জেহেল। কিশোর দু'জনকে দেখিয়ে দিলেন তিনি। বললেন-"তোমরা আমার কাছে যার পারিচয় জানতে চাচ্ছ, ঐ যে সেই লোকটা যাচ্ছে।"

আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ)-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বালক দু'জন ছুটলো। তীরের মত ছুটতে ছুটতে গিয়ে আবু জেহেলের সামনে হাজির হলো দু'জনই।

আবু জেহেল ঘোড়ায় চড়ে ছুটছিল। বালক দু'জনের পক্ষে ঘোড়ায় চড়ে থাকা আবু জেহেলের শরীরে সরাসরি আঘাত করা ছিল অসম্ভব। একজন আক্রমণ করল আবু জেহেলের ঘোড়ায়। আরেকজন আবু জেহেলের পায়ে খোলা তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল।

মুহূর্তের মধ্যেই কাফের সর্দার আবু জেহেল মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মাটিতে পড়েই ছটফট করতে লাগল আবু জেহেল। বালক দু'জন সমানতালে তাকে আঘাত করে চলল।

আবু জেহেলের পাশে পাশে যুদ্ধ করছিল এক ছেলে। হঠাৎ করেই বাবার এই করুণ দশা হতে দেখে সে থমকে গিয়েছিল প্রথমে। এরপর সে বালক দু'জনের একজনের উপর তরবারী চালিয়ে দিল। বালকের মাথা লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত করেছিল আবু জেহেলের ছেলে। কিন্তু সেই আঘাত এসে লাগল বালকের হাতে। হাতটি শরীর থেকে আলাদা হয়ে একটি চামড়ায় ঝুলে রইল।

আবু জেহেলের ছেলে ভেবেছিল আক্রমণ করে সে বালকের হাত যখন কেটে ফেলতে পেরেছে, তখন আর বালক দু'জনকে ধরাশায়ী করা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু তার এই ভাবনার মৃত্যু হলো সামান্য সময়েই।

যেই বালকের হাত কেটে ঝুলে গেছে, যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে সে পায়ের নিচে হাত রেখে একটানে নিজের হাতটা ছিঁড়ে ফেললো। তারপর ছিঁড়ে ফেলা হাত দূরে নিক্ষেপ করে আবারো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই অবাক করা কান্ড দেখে আবু জেহেলের ছেলে দ্রুত সেখান থেকে সট্‌কে পড়ল।

বালক দু'জন আবারো আবু জেহেলের শরীরের উপর চড়ে বসলো। এখনো আবু জেহেল মরেনি। দূরথেকে বালকদের অভানীয় আক্রমণে আবু জেলের এই মরণ দশা দেখে আব্দুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) এগিয়ে এলেন। এক কোপে আবু জেহেলের শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেললেন।

রাসূলের এক ভয়ানক দুশমনকে খতম করল দুই কিশোর। সাহসী কিশোর দু'জনের একজনের নাম মা'আয। এর হাত কাটা গিয়েছিলো। অপর জনের নাম মুআ'ও ওয়ায।

রাসূল (সাঃ)-এর দুই কিশোর সাহাবী এঁরা। এঁদের সাহস ও বীরত্ব দেখে শেষ পর্যন্ত বদর প্রান্তরের সবাই অবাক হয়ে গেলেন।

দুআ

দু'জন একসঙ্গে হলেন। দু'জনই রাসূলের সাহাবী। একসাথে বসে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চান। একটি জিহাদ আগামীকাল শুরু হবে। সেই জিহাদে তাঁরা দু'জনই যোগ দিবেন। সে বিষয়ে আলোচনার জন্যই তাঁদের একসঙ্গে বসা।

একজনের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)। অন্যজনের নাম সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে বললেন– "সা'দ! আগামীকালের যুদ্ধের জন্য চলুন আমরা দুআ' করি। আমরা প্রত্যেকেই যার যার ইচ্ছা ও আশা আল্লাহ্র কাছে ব্যক্ত করবো। অন্যজন আমীন বলবো। তাহলে আমাদের দুআ' কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বেশী।"

সা'দ রাজী হলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের এই প্রস্তাবে। তিনিও ভেবে দেখলেন, যুদ্ধের আগে অবশ্যই দুআ' করে ময়দানে নামা উচিত। আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে হলে আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়াতো কোন উপায় নেই। সেজন্য দু'জনই এক সঙ্গে ময়দানের এক কোণে চলে এলেন।

নির্ধারিত হলো, আগে দুআ' করবেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। আর 'আমীন' বলবেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)। এরপর দুআ' করবেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)। 'আমীন' বলবেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)।

দু'জনই হাত তুললেন। মুনাজাত শুরু হলো। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) দুআ' করে বললেন-"আল্লাহ! আগামীকাল জিহাদের ময়দানে আমাকে সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুর মুকাবেলা করার সুযোগ দিও। সেই শত্রু যেন আমাকে প্রচন্ড আক্রমণ করে এবং আমিও যেন সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারি। এরপর আমি যেন তাকে তোমার রাস্তায় হত্যা করতে পারি। তোমার পথে তার জীবনটা খতম করে দিতে পারি।

... তার গনীমতের সম্পদ যেন আমাদের হাতে চলে আসে। আব্দুল্লাহ ... জাহাশ (রাঃ) বললেন 'আমীন'।"

...া'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর এই ইচ্ছা ও প্রত্যাশা পূরণের ... আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)'আমীন' বলে আল্লাহ্‌র কাছে দরখাস্ত ...রলেন।

এবার আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-এর পালা। তিনি এবার দুআ' করবেন। তিনি হাত তুললেন এবং বললেন– "আল্লাহ! আগামীকাল জিহাদের ময়দানে আমাকে একজন সাহসী শত্রুর মুকাবেলা করার সুযোগ দিও। সে যেন আমার উপর মারাত্মক আক্রমণ করে এবং আমিও যেন তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারি। এর পর সে যেন আমাকে শহীদ করে ফেলে এবং নাক আর কান কেটে ফেলে। কেয়ামতের ময়দানে আমি যখন আপনার দরবারে হাজির হবো, তখন আপনি জিজ্ঞাসা করবেন-"হে আব্দুল্লাহ! তোমার নাক ও কান কিসে কাটা গেল?" আমি তখন আরজ করবো–আমার নাক -কান আপনার এবং আপনার রাসূলের পথে কাটা গেছে। এরপর হে আল্লাহ্। আপনি বলবেন-"তুমি সত্যই বলেছ। আমার রাস্তায় তোমার নাক - কান কাটা গেছে।"'

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন 'আমীন'! তিনিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-এর ইচ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দরখাস্ত করলেন।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-এর দুআ' শুনেই চমকে উঠেছিলেন। আব্দুল্লাহ্ সরাসরি শাহাদাতের জন্য দুআ' করছেন। এর অর্থ হলো, এই দুআ' কবুল হলে জিহাদের ময়দান থেকে জীবিত অবস্থায় আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ) আর ফিরে যেতে পারবেন না। কিন্তু সা'দ (রাঃ)-এর কিছু করার উপায় ছিল না। আব্দুল্লাহ আগেই বলে নিয়েছেন, যার যার ইচ্ছা আমরা আল্লাহ্‌র কাছে ব্যক্ত করবো। আরেকজন 'আমীন' বলবো। সেজন্যই আব্দুল্লাহ্‌র দুআ'র পর সা'দ 'আমীন' বলতে বাধ্য হয়েছেন।

পরদিন যুদ্ধ হলো। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য দুআ' করেছিলেন। তিনি শত্রুকে খতম করে নিজে জীবিত ...লেন। সন্ধ্যার দিকে ময়দানে বের হলেন সা'দ। রক্তে মাখামাখি হওয়া

শহীদ সাহাবীগণের চেহারা দেখতে দেখতে এক জায়গায় গিয়ে সা'দ দেখলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-এর রক্তাক্ত শরীর মাটিতে পড়ে আছে। তাঁর পাশে পড়ে আছে তাঁর কাটা যাওয়া নাক আর কান।

অদ্ভুত দুআ' করেছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ)। সব মানুষই সব কিছুতে জয়ী হতে চায়। কিন্তু রাসূলের এই সাহাবী শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করার জন্য দুআ' করেছিলেন।

তিনি জয়ীও হয়েছেন। তাঁর জয় পরকালে। তাঁর জয় আল্লাহ্র কাছে।

এলেম

দামেস্কের মসজিদে বসে আছেন তিনি।

তাঁর চারপাশে বহু লোকজন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্নজন এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে সবাই কিছু এলেম শিখতে চান। কুরআনের আয়াতের মর্ম শুনতে চান। রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস শুনতে চান।

তিনি হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)। রাসূল (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী। ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এক সময়। হাদীসের এলেম শিখতে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করেছেন। হাদীসের জ্ঞান আহরণ করে করে বহু মানুষের শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন । সবাই এখন তাঁর কাছে আসেন হাদীস শোনার জন্য; দ্বীনের এলেম শিক্ষা লাভ করার জন্য।

সেদিনও দামেস্কের মসজিদে সবাই সমবেত হয়েছেন তাঁর কাছ থেকে এলেম আহরণ করার উদ্দেশ্যে। এজন্য সকলেই খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছেন।

এমন সময় একলোক এসে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর সামনে বসলেন। সবাই উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকালেন। লোকটি হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে বললেন– "আমি শুধু হাদীসের জ্ঞান লাভ করার জন্য মদীনা থেকে আপনার দরবারে এসেছি। আমি শুনেছি, আপনি বহু হাদীস রাসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। এজন্য আমি আপনার দরবারে এসেছি।"

উপস্থিত সব লোকজন চুপ। আবুদ্দারদা (রাঃ) আগত লোকটির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন– "এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন গরজ ছিলনা তো? লোকটি বললেন–জী না। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা।"

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) আবারো জিজ্ঞাসা করলেন–" দেখুন, অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা? বৈষয়িক কিংবা সাংসারিক কোন প্রয়োজন এদিকে ছিল নাতো আপনার?"

আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর পরপর দু'বার প্রশ্ন করায় সবাই সচেতন হয়ে উঠলেন। সতর্ক হয়ে উঠলেন। তিনি কি লোকটিকে পরীক্ষা করছেন? কিন্তু আগত লোকটি একদম ঘাবড়ালেন না। তিনি অবিচল কণ্ঠে জবাব দিলেন– "জ্বী-না। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু হাদীস শিক্ষার জন্যই আমি মদীনা থেকে দামেস্কে আপনার কাছে এসেছি।"

এবার যেন হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। একটা পবিত্র খুশীখুশী ভাব তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি দরাজ কণ্ঠে বললেন-"তাহলে শুনুন! আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি এলেম লাভ করার উদ্দেশ্যে কোন রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য বেহেশ্তের পথ সহজ করে দেন।"

এলেম বলা হয় কুরআন আর হাদীসের জ্ঞানকে। এলেম বলা হয় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে দ্বীনে ইসলাম দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন, সে দ্বীনে ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাকে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) আরো বলে চললেন-"ফেরেশতাগণ এলেম অনুসন্ধানকারীর পথে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও যমীনে যারা বাস করেন, তারা এলেম অনুসন্ধান কারীর গুনাহ্ মাফের জন্য দুআ' করে থাকেন। এমন কি, পানিতে বাস করে যে মাছ, সেই মাছও এলেম অনুসন্ধানকারীর জন্য মাগফিরাতের দুআ' করতে থাকে।"

সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন, আগত ব্যক্তি যেন যা জানতে এসেছেন, তা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে যাচ্ছেন, এমন ভাবে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর কথাগুলো শুনতে লাগলেন। আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর মুখে বলা হাদীসটি শুনতে শুনতে সবার মনেই খুশীর দোলা লাগছিল।

আবুদ্দারদা (রাঃ) আরো বললেন-রাতের আকাশে তারকাগুলোর তুলনায় চাঁদ যেমন উজ্জ্বল, তেমনি সাধারণ কোন ইবাদতকারীর তুলনায় আলেম এবং এলেম অনুসন্ধানকারী অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ। আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কাউকেই দীনার-দেরহামের উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি। তাঁরা এলেমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। যে ব্যক্তি এলেম হাসিল করে, দ্বীনের শিক্ষা লাভ করে, সে যেন তুলনাহীন সম্পদ লাভ করে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হাদীসটি বলে সম্পূর্ণ মজমাকে শোনালেন। সবাই শুনলেন। কুরআন-হাদীস এবং দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের উপকার শুনে গোটা মজমা ধন্য হয়ে গেল।

হাদীস

বাচ্চারা ঘুমানোর আগে আম্মুর কাছে আগের দিনের গল্প শোনে। দাদা-দাদুর কাছে বসে পুরনো দিনের কাহিনী শোনে। আগের দিন গুলোতে মানুষ কিভাবে চলাফেরা করতো, কিভাবে হাট-বাজারে যেত, কিভাবে অফিস-আদালত করত–এসব শোনে। এভাবেই বাচ্চারা দাদা-দাদুর যুগের মানুষের কাহিনী, আম্মুর ছোটকালের গল্প শোনে সেই যুগটা সম্পর্কে জানতে পারে।

সাহাবীগণের কাছে আসত সেই যুগের মানুষ। বড়, বৃদ্ধ সাহাবীগণের কাছে আসতেন অল্পবয়সী সাহাবীগণ। এসে এসে শুনতেন রাসূল (সাঃ)-এর কাহিনী। রাসূল (সাঃ) কী কথা বলতেন, কেমন ভাবে বলতেন, কেমন ভাবে চলতেন, কেমন ভাবে খেতেন, কেমন ভাবে নামায পড়তেন–সাহাবীগণ এসব তাঁদের যুগের মানুষদের শোনাতেন।

রাসূলে করীম (সাঃ) যেই যেই কথা বলতেন, যেমন ভাবে চলতেন, সেগুলো বলাই হলো হাদীস বলা, হাদীস বর্ণনা করা। রাসূল (সাঃ)-এর কথা, কাজ-কর্ম গুলোই হলো হাদীস।

সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন একজন সাহাবী। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। সব সময় খেয়ে না খেয়ে

রাসূলের কাছে কাছে তিনি থাকতেন। রাসূলের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ তিনি মুখস্থ্ করে রাখতেন। বহু সাধনা করে, বহু কষ্ট করে অনেক হাদীস তিনি মুখস্থ্ করেছেন। দ্বীনের শিক্ষা এলেম হাসিলের জন্য তাঁকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

কিন্তু তাঁর যুগের সকল মানুষই এটা বুঝতে পারত না। কেউ কেউ মনে করতেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) এত বেশী হাদীস কিভাবে বলেন? তিনি এত হাদীস কিভাবে মনে রেখেছেন? তিনি কি অনুমান করে কিছু বলে ফেলেন নাকি?

যারা এমন মনে করতেন, তাদের অনেকেই আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কষ্টের কথা জানতেন না। দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের জন্য, হাদীস জানার জন্য তাঁর চেষ্টা ও ত্যাগের কথা বুঝতেন না।

জানাযা সম্পর্কে একদিন আবু হুরায়রা (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন-"রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে ফিরে আসে, সে এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি জানাযা পড়া হতে শুরু করে কবর দেয়া পর্যন্ত শরীক থাকে, সে দুই কীরাত পরিমাণ সওয়াব লাভ করে।"

এক কীরাত পরিমাণ হলো, উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী।

হাদীসটি শোনার পর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর সন্দেহ হলো। এমন হাদীস তো তিনি শুনেননি? আবু হুরায়রা (রাঃ) কোত্থেকে হাদীসটি বললেন? তাঁর সন্দেহ হলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-ও একজন বিচক্ষণ সাহাবী। বয়সে নবীন। কিন্তু বুদ্ধি-জ্ঞান বড়দের মত। জানতেন অনেক কিছুই। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে তিনি বললেন-আবু হুরায়রা (রাঃ)! বুঝে-শুনে হাদীস বলবেন।

ইবনে উমর (রাঃ)-এর কথায় আবু হুরায়রা (রাঃ) মনে মনে রেগে গেলেন। ইবনে উমর (রাঃ)-এর কথার কোন জবাব দিলেন না। সোজা গিয়ে হাজির হলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে। উম্মত জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) হলেন রাসূল-(সাঃ) এর স্ত্রী।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন- "আয়েশা! আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি-আপনি কি কীরাত সম্পর্কিত হাদীস রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেননি?" হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন-"হ্যাঁ, আমি এই হাদীস শুনেছি।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, তিনিও এই হাদীসটি শুনেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এ কথা জানার পর তাঁর সন্দেহ দূর হয়ে গেল। ভিতরে ভিতরে তিনি অনুতপ্ত হলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তখন দুঃখ করে বললেন– "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আমি বাগানে কোন গাছ লাগাইনি। বাজারে কোন জিনিস বিক্রি করিনি। সব কিছু থেকে আমি দূরে সরে থাকতাম। সারাক্ষণ নবীজীর দরবারেই পড়ে থাকতাম। মুখস্থ করার কোন কিছু পেলেই মুখস্থ করে ফেলতাম। কোন খাবার জুটলে খেতাম; না জুটলে না খেয়েই দিন পার করে দিতাম।"

প্রবীন সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর এই দুঃখঝরা কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (সাঃ) ভিতরে ভিতরে গলে গেলেন। বিচক্ষণ সাহাবী ইবনে উমর (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বললেন– "একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আপনি নবীজীর খেদমতে অধিকাংশ সময় হাজির থাকতেন। সুতরাং আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী হাদীস জানেন।"

প্রবীন সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মনের দুঃখ দূর হয়ে গেল। আরেক সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) লজ্জিত হলেন। মাঝখান থেকে হাদীস জানার জন্য সাহাবীগণের ত্যাগের কথা, আগ্রহের কথা আমরা জানতে পারলাম।

লম্বা চুল

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ)- আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর একজন সাহাবী।

সময় পেলেই তিনি আল্লাহ্র রাসূলের কাছে এসে বসেন। সময় না পেলেও সময় করে আসেন। দুনিয়ার যে কোন কাজ-কর্মের তুলনায় রাসূলের কাছে এক মুহূর্ত বসতে পারাকে তিনি অনেক দামী মনে করেন।

রাসূলে করীম (সাঃ) যখন যে নির্দেশ দেন, পালন করেন। কোন কিছু করতে নিষেধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা ত্যাগ করেন। মন চাক আর না চাক, নবীজীর আদেশ-নিষেধ পালনে কোন গড়িমসি করতে তাঁকে কেউ দেখেনি। নবীজী যে বিষয়টি পছন্দ করেন, হুকুম না করলেও সে বিষয়ে সক্রীয় হয়ে উঠেন তিনি। যে বিষয়টি অপছন্দ করেন, বাধা না দিলেও সে বিষয়টি ত্যাগ করেন নির্দ্বিধায়।

ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ) শুধু নন, সকল সাহাবী-ই এমন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনটাই এই ধারায় চলেছে। নবীজীর পছন্দ-অপছন্দই ছিল তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ। তাঁদের যেন আলাদা কোন ইচ্ছাই ছিল না।

ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ) একদিন রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলেন। সেখানে আরো সাহাবীগণ ছিলেন। বড় বড় সাহাবীগণের মাঝে ওয়ায়েল (রাঃ) গিয়ে একদম রাসূলে করীম (সাঃ-এর সামনে হাজির হলেন।

রাসূলে করীম (সাঃ) ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ)-কে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্য কোন চিন্তায় তখন মগ্ন ছিলেন। ওয়ায়েল (রাঃ) সামনে আসতেই নবীজীর মুখ থেকে বের হয়ে এলো-'অমঙ্গল! অমঙ্গল!!'

নবীজী আর কিছুই বললেন না। কিন্তু নবীজীর পবিত্র মুখ থেকে এই দুটি শব্দ শুনেই ওয়ায়েল (রাঃ)-এর যেন আপদমস্তক কেঁপে উঠলেন। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি সমানে ভাবতে লাগলেন, তিনি এমন কী কাজ করেছেন, যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নারাজ হলেন? যার কারণে অমঙ্গল-কথাটি উচ্চারণ করলেন? ওয়ায়েল (রাঃ) তাঁর কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং পোষাক-আষাক সব কিছু নিয়ে ভাবলেন। কিন্তু কোন কূল-কিনারা করতে পারলেন না।

হঠাৎ ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ)-এর মনে হলো, তাঁর নিজের মাথার চুল তো অনেক লম্বা! নবীজী তো পোষাক-আষাক, সূরত-সীরাতের ক্ষেত্রে সব সময় সাদামাটা অবস্থাকে পছন্দ করেন। তাঁর লম্বা চুলের করণেই কি নবীজী নারাজ হলেন? তাঁর লম্বা চুলকে অপছন্দ করেই কি নবীজী অমঙ্গলের কথা বললেন?

ওয়ায়েল (রাঃ)-এর মনের মধ্যে পাকা ধারণা হয়ে গেল যে, তাঁর মাথার লম্বা চুলই যত সমস্যার গোঁড়া। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবার থেকে উঠে পড়লেন। সোজা বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন।

বাড়ীতে গিয়েই ওয়ায়েল (রাঃ) তাঁর লম্বা চুল কেটে খাটো করে ফেললেন। যেই চুলের কারণে রাসূল (রাঃ) তাঁর প্রতি নারাজ হলেন, সেই চুল আর লম্বা রাখা যায় না।

এরপর অন্য একদিন।

ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন। ভয়ে ভয়ে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর একেবারে সামনে গিয়ে বসলেন। রাসূল (সাঃ) ওয়ায়েল (রাঃ) এর দিকে তাকালেন। দেখলেন, ওয়ায়েল তাঁর দীর্ঘ লম্বা চুল কেটেছেটে খাট করে ফেলেছেন। তারপর বললেন– "আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি, তবে কাজটি ভালই করেছো।"

ওয়ায়েল (রাঃ) বুঝতে পারলেন, তাঁর লম্বা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নারাজ ছিলেন না। তবে, চুল খাটো করে ফেলার পর তিনি অনেক খুশী হয়েছেন। কাজটি ভালো হয়েছে বলে তিনি ওয়ায়েল (রাঃ)-কে অভয় দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা শুনে হযরত ওয়ায়েল (রাঃ) এর আত্মায় যেন পানি এল। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আনন্দে আনন্দে তাঁর সমস্ত হৃদয় ভরে গেল।

টিল

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর একজন সাহাবী। যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সেদিন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নবীজীর কথামতই চলেছেন।

রাসূল (সাঃ)-এর অন্যান্য সাহাবীগণের মতই তিনিও নবীজীর কোন কথা শুনলে তা মাথা পেতে গ্রহণ করতেন। রাসূল (সাঃ)-এর কথার বিরুদ্ধাচরণ একদম সহ্য করতে পারতেন না। যে যাই বলুক, নবীজী কী বলেছেন সেটাই তিনি সন্ধান করতেন। অন্য কোন সুবিধা ও চিন্তা তাঁর মাথাতেই আসত না।

আল্লাহ্‌র রাসূলের সাহাবীগণের চরিত্রই এমন ছিল। এর কোন ব্যতিক্রম হতে কেউ দেখেনি। নবীজীর শত্রুরাও সাহাবীগণের নবীপ্রেমের এমন নমুনা দেখে হতবাক হয়ে যেত। তারা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন মানব কাফেলার এত আনুগত্য আর দেখেনি! আল্লাহ্‌র রাসূলের এক-একজন সাহাবী নবীজীর হুকুম মানতেন জীবনের সব কিছুরই বিনিময়ে। জীবন দিতে হলে জীবন দিতেন। আত্মীয়তা কেটে দিতে হলে আত্মীয়তা কেটে দিলেন। অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হলে অস্ত্র হাতে তুলে নিতেন। ধৈর্য ধরতে হলে চরম ধৈর্য ধরেই অপেক্ষা করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) তেমনই একজন সাহাবী। রাসূল (সাঃ)-এর কোন ফরমান তার কাছে যে কোন দামী বস্তুর চেয়ে মূল্যবান।

তিনি একদিন ঘর থেকে বের হলেন। বের হয়ে দেখলেন, বাইরে বাচ্চারা খেলাধূলা করছে। বাচ্চাদের মাঝে তিনি নিজের ভাতিজাকে দেখলেন। সেও খেলছে অন্যদের মত।

ভাতিজার খেলার ধরনটা ছিল ভিন্ন। শিশু ভাতিজা পাথর উঠিয়ে উঠিয়ে আঙ্গুল দিয়ে ছুঁড়ে মারছিল। ঢিল মেরে মেরে খেলা করছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) ভাতিজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন– "শোনো বাপু! এরকম খেলা খেলবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এলোপাতারি ঢিল ছুঁড়ে খেলাধূলা করায় কোন ফায়দা নেই। এভাবে ঢিল মেরে কোন জন্তু-জানোয়ার আর পাখি শিকার করা যায় না। এভাবে ঢিল মেরে মেরে ইসলামের কোন শত্রুকেও আঘাত করা যায় না। বরং কারো চোখে আঘাত পেতে পারে কিংবা দাঁত ভেঙে যেতে পারে।"

ভাতিজাতো ছোট্ট ছেলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ)-এর কথার মর্ম সে বুঝতেই পারেনি। চাচা যে তার সামনে একটি হাদীস বলেছেন'। হাদীস শুনলে যে মানতে হয়'। হাদীসের উপদেশ না শুনলে যে ভীষণ খারাপ হয়-সেটা বুঝলোই না। বাচ্চা শিশুদের যা স্বভাব তা-ই সে করে চললো।

যতক্ষণ চাচাকে সামনে সামনে দেখল, ভাতিজা আর ঢিল ছুঁড়ে খেলা করল না। যখনই দেখল, চাচা একটু অন্য মনস্ক হয়ে আছেন, তখনই আবার ঢিল ছুঁড়তে শুরু করল। ঢিল মেরে মেরে খেলা করায় যে আনন্দ শিশু ভাতিজা পেয়েছে, চাচার কথায় তা ছাড়তে পারলো না। শিশুর মন, যখন যা ইচ্ছা হয় তাই করতে থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) কিছুক্ষণ পর এসে দেখলেন, ভাতিজা আবারো ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করছে। তাঁর দারুণ গোস্বা হলো। তিনি খুবই রেগে গেলেন। আল্লাহ্র রাসূলের একটি হাদীস তিনি শোনালেন। অথচ তা মানা হলো না। তিনি কিছুতেই যেন তা সহ্য করতে পারলেন না।

ভাতিজাকে তিনি ডাকলেন। তারপর বললেন-"আমি তোকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস শোনালাম। তবুও তুই সেই কাজই করছিস? আল্লাহ্র কসম! আমি আর কখনো তোর সাথে কথা বলবো না।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন হাদীসের প্রতি কোন রকম উদাসিনতা সাহাবীগণ সহ্য করতে পারতেন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) তাঁর ভাতিজার সঙ্গে এ কারণে কথা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন।

সালাম

নবীজীর সাথে তাঁর সম্পর্ক গভীর। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজীর সাথে সাথে সব সময় থাকেন। প্রতিটি জিহাদে তিনি নবীজীর সাথে ছিলেন।

নবীজীর বেশীর ভাগ খেদমতের ভার তাঁর উপর থাকত। নবীজীর উযুর পানি, জুতা ইত্যাদি তিনি এগিয়ে দিতেন। দূর থেকে এসে অনেকেই

মনে করতেন, তিনি নবী পরিবারেরই একজন। নবীজীর বাড়ীতে এত অবাধ যাতায়াত ছিল তাঁর এবং নবীজীর খেদমতে এত স্বাচ্ছন্দ্য ছিলেন তিনি, তাঁকে নবী পরিবারের লোক মনে করাই ছিল স্বাভাবিক।

তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন তখন নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে যেতেন। নবীজীর বিভিন্ন রকম খেদমতে শরীক হয়ে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। নবীজীর যে কোন খেদমতে শরীক থাকার অনুমতি নবীজীও তাঁকে দিয়ে রেখেছেলিন। নবীজীর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী চলতেন ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

কোন কাজে নবীজী আনন্দিত হলে সেই কাজ করতেন বেশী বেশী। কোন কাজে নবীজী নারাজ হলে সে কাজ থেকে নিজেকে বহু দূরে সরিয়ে নিতেন। কিছুতেই যেন নবীজী নারাজ না হন, এমন ভাবেই তিনি চলতেন।

একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। দেখলেন, রাসূলে করীম (সাঃ) নামায পড়ছেন।

ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনা। তখন নামাজে মগ্ন থেকেও সালাম-কালাম করা কথাবার্তা বলার অনুমতি ছিল। নামাযে থেকে কথা বললে নামায ভেঙে যেত না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবীজীকে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে সালাম দিলেন। সালাম দিলেন তো দিলেনই; সালামের জবাব আর আসল না। নবীজীর সালামের জবাবের অপেক্ষার কয়েক মুহূর্ত আব্দুল্লাহ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু নবীজী কোন জবাব দিলেন না, নামায পড়তেই থাকলেন।

কারো প্রতি নারাজ হলে, কারো প্রতি বিরক্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের জবাব দিতেন না। যার প্রতি নারাজ হতেন, তাঁর সাথে কথা বন্ধ করে দিতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তো পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। কারো প্রতি নারাজ হলে যে নবীজী সালামের জবাব দিতেন না, এই বিষয়টা ইবনে

মাসউদ (রাঃ) খুব ভালো করেই জানতেন। এবার কি তাহলে নবীজী তাঁর উপর নারাজ হয়ে গেলেন? তাঁর কোন কাজে কি নবীজী নাখোশ হলেন?

হতেও তো পারে নবীজী তাঁর কোন কাজে তাঁর প্রতি নারাজ হয়েই আছেন। এরকম আকাশ-পাতাল ভাবনায় তিনি ডুবে গেলেন। নতুন-পুরনো, অতীত-বর্তমান বহু বিষয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না, কী কারণে নবীজী তাঁর উপর নারাজ হতে পারেন। তবে একটি বিষয়ে তিনি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে, নবীজী তাঁর প্রতি নারাজ। নবীজী তাঁর প্রতি নাখোশ। তা না হলে সালাম দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবীজী সালামের জবাব দিতেন।

অতীত আর বর্তমানের বিভিন্ন কাজ-কর্মের কথা তাঁর মনে হতে লাগলো। একবার মনে হয়, এই কারণে নবীজী রাগ করেছেন। আরেকবার মনে হয়, ঐ কারণে নবীজী রাগ করেছেন। ভাবনা কোনটার মধ্যেই এসে স্থির করতে পারছেন না। পেরেশানীর এক দীর্ঘ স্রোতে যেন তিনি ভেসে চলেছেন।

এরই মধ্যে নবীজীর নামায শেষ হলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তখন ভয়ে-চিন্তায় প্রায় ঘেমে উঠেছেন। উৎসুক হয়ে নবীজীর দিকে তাকিয়ে আছেন। নবীজী (সাঃ) নামায শেষ করেই সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন– "এখন থেকে নামাযে অন্য কথা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এজন্যই আমি তোমার সালামের জবাব দেইনি।"

নবীজীর কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ভয় কেটে গেল। তাঁর দেহে যেন আত্মটা ফিরে এল। তাঁর পেরেশানীর ঘাম শুকিয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, নবীজী তাঁর প্রতি নারাজ নন। কিন্তু নামাযে অন্য কোন কথা বলা মানা হয়ে গেছে বলেই তাঁর সালামের জবাব দেননি।

রাসূলের সামান্য অসন্তুষ্টির ভয়ে যেই সাহাবী অস্থির হয়ে উঠে ছিলেন, রাসূল অসন্তুষ্ট হননি জানতে পেরে সেই সাহাবী-ই খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

জখম

যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে।

রাত হয়ে গেলো। একটি পাহাড়ী এলাকায় রাত কাটাতে হবে। শত্রুর আশংকা আছে। এখানে সবাই মিলে ঘুমিয়ে পড়লে চলবেনা। দু'একজনকে সজাগ থাকতে হবে। পাহারা দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন, "আজ রাতে পাহারা দিতে পারবে এমন কে কে আছ? আমার দু'জন লোক চাই।"

সাহাবীগণের মধ্য থেকে হযরত আম্মার (রাঃ) এবং হযরত আব্বাদ (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন, এ কাজের দায়িত্ব নিতে আমরা প্রস্তুত।

পাহাড়ের একটি অংশ ছিলো অরক্ষিত। সেদিক দিয়ে শত্রুর আক্রমণ হওয়ার আংশকা ছিলো। পাহারা দিতে হলে সেদিকেই দিতে হবে। দুই সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন। সাহাবী দু'জন সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পাহারা দিতে এসে দু'জনই আলোচনায় বসলেন। কিভাবে পাহারা দিলে ভালো হবে সেই আলোচনা। এতো আর এক দু'ঘন্টার ব্যাপার নয়, সারারাত সজাগ থাকতে হবে। বুঝে-শুনেই পাহারার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আব্বাদ (রাঃ) আম্মার (রাঃ)-কে বললেন-চলুন আমরা ভাগ ভাগ করে পাহারা দেই। অর্ধেক রাত পর্যন্ত আপনি ঘুমিয়ে থাকবেন, আমি পাহারা দেবো। বাকী অর্ধেক রাত আমি ঘুমাবো, আপনি সজাগ থেকে পাহারা দিবেন।

ঃ কেন একসঙ্গে দু'জন সজাগ থাকলে তো কোন অসুবিধা নেই?

ঃ একসঙ্গে দু'জনই যদি সজাগ থাকি, তাহলে কোন এক সময় টলতে টলতে দু'জনই ঘুমিয়ে পড়তে পারি আর তখন তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। শত্রু আসলে শত্রুকে বাধা দেয়ার মত কেউ সজাগ থাকবে না।

ঃ একজন ঘুমিয়ে থাকলে শত্রু এসে যদি আরেকজনকে আক্রমণ করে বসে?

ঃ আমাদের মধ্য থেকে যে সজাগ থাকবে, তাঁর কোন বিপদ হলে সে ঘুমিয়ে থাকা বন্ধুকে ডেকে তুলবে।

আব্বাদ (রাঃ)-এর কথায় আম্মার (রাঃ) সম্মত হলেন। সাব্যস্ত হলো, প্রথম ভাগে সজাগ থেকে পাহারা দিবেন আববাদ আর ঘুমিয়ে থাকবেন আম্মার। রাতের দ্বিতীয় ভাগে সজাগ থাকবেন আম্মার আর ঘুমিয়ে থাকবেন আববাদ।

যা সব্যস্ত হলো, তাই হলো। আম্মার (রাঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর এখন ঘুমানোর পালা। আব্বাদ (রাঃ) সজাগ থেকে পাহারা দিতে লাগলেন।

পাহারা দিতে দিতে আব্বাদ (রাঃ) ভাবলেন, এ সময়টা খামাখা নষ্ট করে কী হবে, নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেই হয়। কোন শত্রু আসলে নামাযে থেকেও টের পাওয়া যাবে।

যেই ভাবনা সেই কাজ। আববাদ (রাঃ) নামাযের নিয়ত করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর ঠিক এই সময়েই এলো শত্রু পক্ষের এক লোক। এসে নিচ থেকে দাঁড়িয়ে শত্রুটি আববাদ (রাঃ)-কে দেখতে পেলো। শত্রুটি ভাবলো, মাত্র একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। একেতো তীর মেরে আহত করে ফেলা যায়।

হযরত আববাদ (রাঃ) তখনো নামায পড়ছেন। শত্রুটি একটি একটি করে তিনটি তীর হযরত আববাদ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে দিলো। দেখা গোলো, প্রতিটি তীরই আববাদ (রাঃ)-এর গায়ে এসে বিঁধে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাঁর জায়গা থেকে সামান্যও নড়ে চড়ে দাঁড়ালেন না। শত্রুটি ভাবনায় পড়ে গেলো।

এদিকে আববাদ (রাঃ)-এর গায়ে যখন একটি একটি করে তীর এসে বিঁধ ছিলো, তিনি নামাযের মধ্যেই হাত দিয়ে তীরগুলো টেনে তুলছিলেন। তিনটি তীরই তিনি নিজ হাতে টেনে তুলে ফেলেছেন; কিন্তু নামায ছাড়েন নি।

ধীরস্থিরভাবে নামায শেষ করলেন আববাদ (রাঃ)। তারপর আম্মার (রাঃ) কে ডেকে তুললেন। দু'জন একসঙ্গে যেই শত্রুর খোঁজে উঠে

দাঁড়ালেন। শত্রু তখনই টের পেয়ে গেলো যে, মানুষ এখানে একজন নয়, দু'জন। বুঝতে পারলো ভাবগতিক সুবিধার নয়। এক মুহূর্তও দেরি করলো না। সাথে সাথেই পালিয়ে গেলো। শত্রুটি পালিয়ে যাবার পর আম্মার (রাঃ) আববাদ (রাঃ)-এর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখলেন, হযরত আববাদ (রাঃ)-এর শরীরের তিনটি জায়গা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আম্মার (রাঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনার শরীরে তিনটি জখম হয়ে গেলো, আপনি আমাকে ডাকলেন না কেন?

আববাদ (রাঃ) নামাযের সময় তাঁর গায়ে তীরের আঘাত লাগার কথা জানালেন। তারপর বললেন—"নামাযে দাঁড়িয়ে আমি সূরায়ে কাহাফ পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। সূরাটি শেষ না করে রুকূতে যেতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো না।

যখন আমি ভাবলাম, এভাবে বারবার তীরের আঘাতে আমার মৃত্যু হয়ে গেলে রাসূল (বাঃ) আমাদেরকে যেই পাহারার কাজে নিযুক্ত করেছেন, তা ব্যর্থ হয়ে যাবে; তখনই আমি দায়িত্বের কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম। নামায শেষ করে ফেললাম।

যদি পাহারা দেয়ার এই দায়িত্ব আমার কাঁধে না থাকতো, তাহলে আঘাতে আঘাতে মরে যেতাম; তবুও সূরা শেষ করার আগে রুকূতে যেতাম না।"

হযরত আববাদ (রাঃ)-এর এই আবেগময় কথা শুনে হযরত আম্মার (রাঃ) অভিভূত হয়ে গেলেন। আশ্চর্য! জীবনের চেয়েও তাঁর কাছে নামাযের দাম অনেক বেশী।

মনোযোগ

বহু বাগানের মালিক। বাগানে বাগানে তাঁর অনেক সময় কাটে। বাগানে বিশ্রাম করেন। বাগানে নামায পড়েন। বাগানে ঘুরে ফিরে আনন্দ পান।

তিনি হযরত আবু তালহা (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয় সাহাবী।

নিজের একটি বাগানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন একদিন। গভীর

মনোযোগের সাথে নামায পড়ছেন। নামায পড়ার সময় আল্লাহ্‌র ধ্যান ছাড়া আর কোন দিকে তাঁর মন যায় না।

নামায পড়ে তিনি আনন্দ পান। নামাযের সময়টা তাঁর কাছে মধুর মত লাগে। নামাযে কোন ব্যাঘাত সহ্য করতে পারেন না তিনি।

সেদিন যখন নামায পড়ছিলেন, তখনই একটি পাখি উড়ে এসে একটি গাছের ডালে বসলো। তারপর আবার উড়তে শুরু করলো। ঘন গাছপালায় ভরা বাগান। সবদিকেই গাছ আর গাছের ডাল। পাখিটি কোন দিক দিয়েই বের হতে পারছে না।

বার বার উড়ার চেষ্টা করেও পাখিটি গাছের ডালে ডালে আটকা পড়ে যাচ্ছে। ডালে ডালে শব্দ হচ্ছে। পাখিটি কিচিরমিচির শব্দে ডেকে উঠছে।

আবু তালহা (রাঃ) নামাযের মধ্যে থেকেই পাখির কাণ্ড-কারখানা টের পাচ্ছিলেন। দুষ্ট পাখিটি উড়াউড়ি করছিলো তাঁর সামনেই।

হঠাৎ তাঁর মনোযোগ পাখির দিকে চলে গেলো। পাখিটির দিকে তিনি তাকালেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে পাখির উড়াউড়ি দেখলেন। পাখির ডানা ঝাঁপটানি দেখলেন। অল্প কিছুক্ষণ পাখির প্রতি তাঁর মনোযোগ আটকে রইলো।

সামান্য পরেই আবু তালহা (রাঃ)-এর খেয়াল হলো, আরে করছেন কী তিনি! তিনি তো নামাযে আছেন। নামাযে থেকে অন্যদিকে মনোযোগ! নামাযে থেকে অন্যদিকে চোখ ফেরানো!

তিনি লজ্জা পেলেন মনে মনে। টের পেলেন, নামাযে তিনি ভুল করে ফেলেছেন। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে, ভাবতে ভাবতে আবার সতর্ক হয়ে গেলেন। আবারো মনোযোগ ফিরিয়ে আনলেন। সুন্দরভাবে নামায শেষ করলেন।

আবু তালহা (রাঃ) নামাযে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার এই ঘটনা ঘটে যাওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেলেন। কেন এমন হলো? নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো কোন কারণে? ভেবে দেখলেন, বাগানে এসে পাখিটি উড়াউড়ি করছিলো বলেই এমনটি ঘটেছে। পাখি অবলা প্রাণী। পাখির কী দোষ! বাগানের কারণেই এমন হয়েছে, ভেবে স্থির করলেন তিনি।

তার পরই আবু তালহা (রাঃ) ছুটলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারের দিকে।

রাসূলের দরবারে এসে তিনি সব খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুনলেন আবু তালহা (রাঃ)-এর কথাগুলো। সবকিছু খুলে বলার পর আবু তালহা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বাগানের কারণেই আমার এই বিপদ। বাগানের কারণেই আমার নামাযে অমনোযোগিতা এসেছে। তাই বাগানটি আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিচ্ছি। আপনার ইচ্ছামত আপনি তা ব্যয় করুন।

নামাযের ক্ষতি সহ্য করতে পারলেন না আবু তালহা (রাঃ)। উল্টো বাগানের কারণে নামাযে ক্ষতি হয়েছে বলে বাগানটিকেই আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিলেন।

বাগানটি পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হলো। নবীজী সেই টাকা ইসলামের কাজে খরচ করলেন।

অন্য জগত

যেন তিনি এই পৃথিবীতে নেই। অন্য কোন জগতে বসবাস করছেন। অন্য জগতে মন, চিন্তা আর ধ্যান। শরীরটা শুধু এই পৃথিবীতে আছে। নড়াচড়া করছে। উঠা বসা করছে। এই অবস্থা হয়ে যেতো তাঁর নামায পড়তে দাঁড়ালে।

তাঁর নামায ছিলো অনেক দামী নামায। অনেক বেশী মনোযোগের নামায। নামাযে দাঁড়ালে তাঁকে মনে হতো, একটি কাঠের লাটি মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। লাঠিটি যেমন নড়াচড়া করেনা, নামাযে দাঁড়ালে তিনিও কোন রকম নড়াচড়া করতেন না।

রুকূতে গিয়ে দীর্ঘ সময় পার করে দিতেন। রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে রুকূতে যেতেন ফজর পর্যন্ত রুকুতেই থাকতেন। আবার কোন কোন সময় সেজদায় কাটিয়ে দিতেন সারারাত। সেজদায় গিয়ে এমনই জমে থাকতেন যে, মাঝে-মধ্যে তাঁর পিঠে আর কোমরে পাখি এসে বসে যেতো। তিনি টেরও পেতেন না।

পাখিটিও বুঝতে পারতো না যে, সে কোন জীবিত মানুষের গায়ের উপর বসে পড়েছে।

তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশেষ স্নেহ আর ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) একদিন নামায পড়ছেন। গভীর মনোযোগ তাঁর নামাযে। পাশে শুয়ে আছে তাঁর এক ছোট্ট ছেলে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর কোন দিকে কোন খেয়াল নেই; যেন তিনি এই পৃথিবীতেই নেই। হঠাৎ ছাদ থেকে পড়লো একটি সাপ। সাপটি কিলবিল করতে করতে শুয়ে থাকা ছেলেটির গায়ের উপর দিয়ে চলে গেলো। ভয়াবহ অবস্থা!

বাচ্চা ছেলের মন এমনিতেই নরম। তার উপর আবার কিলবিল করতে করতে শরীর বেয়ে একটি সাপের এগিয়ে যাওয়া! ভয়ে ছেলেটি চিৎকার করে উঠলো।

চিৎকার শুনে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন এসে হাজির। এসে সবাই দেখলো ঘরের এক কোণে একটি সাপ। দৌড়ে গিয়ে লাঠি-সোঠী নিয়ে আসলো। সারা বাড়ীতে হৈচৈ পড়ে গেলো। তারপর সাপটিকে মেরে ফেললো সবাই।

ঘরে এখন মানুষ গিজগিজ করছে। কী ভয়ানক কান্ড! ঘরে সাপ পাওয়া গেছে! আরেকটুর জন্য বাচ্চা ছেলেটিকে ছোবল দেয়নি। ভয়ে উত্তেজনায় সবাই টগবগ করছে।

কিন্তু সেই ঘরেই তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) শান্তির সাথে গভীর মনোযোগ দিয়ে নামায পড়ছেন। এদিকে এত মহা হুলুস্থুল ঘটে গেলো, তাতে তাঁর কিছুই হলো না। তিনি ফিরেও তাকালেন না। নামায শুরু করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত একইভাবে নামায পড়ে চলেছে। তাঁর নামায পড়াকালে তাঁর পাশেই যে ছাদ থেকে একটি সাপ পড়েছে, সাপটি তাঁর ছেলের গায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে, ছেলেটি চিৎকার করেছে, বাড়ীর লোকজন এসে সাপটিকে মেরে ফেলা হয়েছে একই ঘরে নামায পড়তে থেকেও এসব কিছুই যেন তিনি টের পাননি।

বেশ কিছু সময় পর তাঁর নামায শেষ হলো। তিনি সালাম ফিরালেন। তারপর তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন–কিসের যেন হৈচৈ শুনছিলাম? কী ব্যাপার কিছু হয়েছে নাকি'?

তাঁর স্ত্রীর চক্ষু একদম ছানাভরা হয়ে গেলো। বলছেন কী তিনি! তাঁর পাশেই এত ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে গেলো; তিনি কিছুই জানেন না!

ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর স্ত্রী বললেন—"আল্লাহ্ আপনার উপর শান্তি দিন। বাচ্চার প্রাণটা তো আরেকটুর জন্য চলেই গিয়েছিলো। অথচ আপনার দেখছি কোন খবরই নেই।"

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বললেন—"আরে রাখোতো! অন্য কোন দিকে খেয়াল করলে ঠিকমত নামায হবে নাকি? যেখানে যা-ই ঘটুক, নামায তো ঠিকমত পড়তে হবে।"

পছন্দ

দু'জন লোক মক্কায় এলেন। লোক দু'জন হারিসা গোত্রের। হারিসা গোত্রের বাস মক্কা থেকে অনেক দূরে। সেই দূর থেকে এরা এসেছে। তারা মক্কায় এসেছেন একটি বালকের খোঁজে। বালকটি একজনের ছেলে, আরেক জনের ভাতিজা। বালকটির নাম যায়েদ।

যায়েদের বাবা আর চাচা শুনে এসেছেন, যায়েদ মক্কায় একজনের গোলাম হয়ে আছে। বহুদিন আগে যায়েদকে ডাকাত দল ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিলো। এরপর থেকে তারা খোঁজ-খবর করেছে বহু। যায়েদের বাবা কাঁদতে কাঁদতে মানুষকে যায়েদ হারানোর কাহিনী বলেছে।

কিন্তু যায়েদের কোন খোঁজ তারা এতদিন পাননি। এই ক'দিন আগে মক্কায় হজ্ব করতে আসা কয়েকজন লোকের কাছে শুনেছেন, যায়েদ মক্কায় আছে। ভালো ভদ্র একজন মানুষের কাছে আছে। যায়েদ সেই মানুষেরই গোলাম। সেই মানুষটির নাম হলো মুহাম্মদ (সাঃ)।

যায়েদের বাবা আর চাচা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন। এসে বসলেন। তার পর তারা বললেন- আমাদের এক ছেলে আপনার গোলাম হয়ে আছে। আমরা মুক্তিপণের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে চাই। আপনি যায়েদকে আমাদের হাতে ফেরৎ দিন। আমরা আপনার কাছে আবেদন করছি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদের বাবা আর চাচার দিকে তাকালেন। সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে তারা এসেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদের কথা ভাবলেন। বালক যায়েদ। সবাই জানে, যায়েদ রাসূলের গোলাম। কিন্তু তিনি তো যায়েদকে সন্তানের অধিক মমতা দিয়ে লালন-পালন করেছেন।

যায়েদকে তিনি সোহাগ আর আদর দিয়ে বড় করে তুলেছেন। খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। সেই বিয়ের সময় খাদীজা (রাঃ) এক ছোট্ট বালককে গোলাম হিসাবে রাসূল (সাঃ)-কে উপহার দেন। সে দিন থেকে বালক যায়েদ রাসূল (সাঃ)-এর প্রিয় সন্তানের মত রাসূলের পাশে পাশে থাকে। আজ তাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনে মনে কষ্ট হতে লাগালো রাসূলের। আদরের যায়েদ কি সত্যিই চলে যাবে? চলে গেলে তো আর ফিরিয়ে রাখা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদের বাবাকে বললেন, "আপনারা যায়েদকে ডাকুন। তাকে জিজ্ঞাসা করুন। সে যদি আপনাদের সাথে চলে যেতে চায়, তবে আর মুক্তিপণ লাগবে না। মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে আমি মুক্ত করে দেবো। যদি সে না যেতে চায়, তাহলে তার উপর জোর জবরদস্তি করে আপনাদের সাথে পাঠাতে পারবো না।"

যায়েদের বাবার মনে খুশী ছড়িয়ে পড়লো। যায়েদ যার গোলাম, তিনিই যদি যায়েদকে ছেড়ে দিতে রাজী থাকেন, তাহলে তো আর কোন অসুবিধ নেই। যায়েদকে এবার ফিরে পাওয়া যাবেই নিশ্চই।

যায়েদকে ডাকা হলো। যায়েদ তার বাবা-চাচাকে দেখে চিনতে পারলেন। বহুদিন পর বাবা-চাচাকে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদকে বললেন-"তারা তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। তুমি যেতে চাইলে আমি বাধা দেবো না।"

যায়েদ তার বাবা আর চাচার দিকে তাকালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকেও তাকালেন। রাসূলকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভাবতেই যেন তার প্রাণটা ছিড়ে যাবার জোগাড় হলো। বালক যায়েদ বললো–ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি থাকতে আমি কি আর কাউকেও পছন্দ করতে পারি? আপনি আমার কাছে আমার বাবা-চাচার মতই। আপনাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

বালক যায়েদের কথা শুনে তার বাবা আর চাচা একদম 'থ' হয়ে গেলেন। এতদিন পর ছেলেকে পাওয়া গেলো। সেই ছেলের মনিব পর্যন্ত তাকে মুক্ত করে দিতে রাজী হয়ে গেলেন। এখন ছেলেই কিনা বাড়ী যেতে অস্বীকার করে বসছে! তারা ভিতরে ভিতরে খুবই রেগে গেলেন। তারা বললেন-যায়েদ! তুমি কি বাবা-চাচাকে ছেড়ে গোলামী করাকেই পছন্দ কর নাকি?

অনমনীয় যায়েদ। রাসূলের আদর পাওয়া যায়েদ সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন-"হ্যাঁ, আমি গোলামী করাই পছন্দ করি। এই মহান ব্যক্তির গোলামীর মাঝেই আমি এমন কিছু পেয়েছি, যার বিনিময়ে আমি দুনিয়ার আর কোন জিনিসই পছন্দ করতে পারি না।"

যায়েদের কথা শুনে সবাই বিস্মিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়েদকে জড়িয়ে ধরলেন। যায়েদকে টেনে কোলে তুলে নিলেন। তারপর বললেন, "আজ থেকে যায়েদকে আমি আমার ছেলে বানিয়ে নিলাম।"

যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পালকপুত্র হয়ে গেলেন। রাসূলের প্রতি ছেলের এমন ভালোবাসা দেখে যায়েদের বাবা আর চাচা খুশী মনেই বাড়ী ফিরে গেলেন।

সেই মহিলা

সারা মদীনায় খবর ছড়িয়ে পড়েছে। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণের অনেক ক্ষয়-ক্ষতির খবর মদীনার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে।

পুরুষ, যুবক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যবাই যুদ্ধে চলে গেছেন। মদীনা শহরে তখন শুধু ছিলেন বাচ্চা শিশু আর মহিলাগণ। উহুদ যুদ্ধের দুঃসংবাদ পাওয়ার পর মদীনার ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেছে। দুঃখ-বেদনা আর ভয়ে সবাই অস্থির!

বহু মহিলা বাড়ীর ভিতর থেকে বের হয়ে পড়েন। রাস্তার এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কার কী অবস্থা হয়েছে কে জানে! মুসলমানদের কাফেলা ফিরে এলে স্বচক্ষে দেখতে হবে। কারো বাবা যুদ্ধে গেছেন। কারো ভাই

গেছেন। কারো সন্তান যুদ্ধে গেছেন ইসলামের পথে লড়াই করার জন্য। সেই যুদ্ধেরই দুঃসংবাদ এসেছে।

সবাইতো আর সুস্থ শরীরে ফিরে আসবেন না। যুদ্ধে অনেকেই শহীদ হয়েছেন। অনেকেই জখম হয়েছেন। সেজন্যই মদীনার রাস্তায় মহিলারা ভিড় করে ফেলেছেন। সবাই অপেক্ষা করছেন। কখন কাফেলা ফিরবে। কখন যুদ্ধের আসল খবর পাওয়া যাবে।

ভিড় থেকে একজন মহিলা বের হয়ে পড়লেন। মদীনার রাস্তা ধরে উহুদ প্রান্তরের দিকে ছুটলেন। শহররের শেষ প্রান্তরে এসে মহিলা দাঁড়ালেন। দূরে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের কাফেলা এগিয়ে আসছে। মহিলা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রথম যে দলটির সাথে মহিলার সাক্ষাৎ হলো, মহিলা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন– "তোমরা বলতে পারো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?

দলের লোকজন তাঁর কথার কোন জবাব দিলেন না। দলের মাঝখান থেকে একজন জানালেন, "আপনার বাবা শহীদ হয়ে গেছেন।"

মহিলা ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন-ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পর মহিলা আবারো প্রশ্ন করলেন- "তোমরা বলো না! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেমন আছেন?"

দলের মাঝখান থেকে আরেকজন বললেন-"আপনার স্বামী শহীদ হয়ে গেছেন।"

মহিলা আবারো ধীরস্থির কণ্ঠে পড়লেন– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন না। ব্যথা-বেদনায় মুষড়ে পড়লেন না; বরং মহিলা আরেকবার জিজ্ঞাসা করলেন– "তোমরা আমাকে বলো আল্লাহ্‌র রাসূল কেমন আছেন?"

দলের মধ্য থেকে এবার আরেকজন বললেন, "আপনার ছেলে শহীদ হয়ে গেছেন।"

মহিলা আবারো ভারিকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ছেলের মৃত্যু সম্পর্কে মহিলা কাউকে কোন প্রশ্ন করলেন না। মহিলা আরো একবার প্রশ্ন করলেন-"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেমন আছেন?"

এবার একজন জবাব দিলেন– “আপনার ভাই শহীদ হয়ে গেছেন।”

মহিলা এবারো ব্যথিতকণ্ঠে পড়লেন– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ভায়ের কোন খবর মহিলা জানতে চাইলেন না। মহিলা যেন তাঁর আসল প্রশ্নেরই জবাব পাচ্ছেন না। আসল সংবাদই জানতে পারছেন না। পর পর প্রশ্ন করেও আসল খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সেই খবর যে পেতেই হবে! তাই শেষ পর্যন্ত মহিলা প্রশ্ন করলেন– “অন্য কোন সংবাদ নয়, তোমরা আগে জানাও আমাদের প্রিয় নবীজী কেমন আছেন?”

দলের মধ্যে যে ক'জন সাহাবী ছিলেন, যে ক'জন সাহাবীর সঙ্গে মহিলার সাক্ষাৎ হয়েছে, সবাই অবাক হয়ে গেছেন। মহিলা তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। ছেলের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। ভায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। সামান্য ভেঙেও পড়লেন না। দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন না। উল্টো প্রশ্ন করে চলেছেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেমন আছেন!” রাসূলের খবর শোনার জন্যে মহিলা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। দুনিয়ার সবকিছুই এই মহিলার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। রাসূলের প্রতি কী পবিত্র ভালোবাসা– সুবহানাল্লাহ!

মহিলার শেষ প্রশ্নের জবাবে দলের অনেকেই উত্তর দিলেন– “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিরাপদ আছেন। তিনি পিছনে আসছেন।”

মহিলা যেন আরো ব্যাকুল হয়ে গেলেন। অস্থিত হয়ে গেলেন– বললেন তোমরা আমাকে বলো, তিনি কোথায় আছেন?

সাহাবীগণ পিছনের একটি দলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন-ঐ দলের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ছুটতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে গিয়ে সেই দলটির সামনে দাঁড়ালেন। দেখলেন, সবার মাঝখানে সওয়ারীতে চড়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এগিয়ে আসছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখত পেয়ে মহিলার হৃদয়-মন রেকারার হয়ে গেলো। এক দৌড়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গায়ের চাদর জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক। আমি আপনার জন্য চিন্তায় চিন্তায় যারপর নই পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি যখন জীবিত আর নিরাপদ আছেন, তখন আমি আর কারো মৃত্যুর পরোয়া করি না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

যুদ্ধফেরৎ সাহাবীগণ পিতাহারা, স্বামীহারা, সন্তানহারা, ভাইহারা এই মহিলার, রাসূলের প্রতি এমন ভক্তি আর ভালোবাসা দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন।

প্রিয় বাগান

মানুষের যত কিছু থাকে তার কোন কোনটার উপর তার মায়া পড়ে যায়। সেই জিনিসটি প্রিয় হয়ে উঠে, সেই জিনিসটি পছন্দের জিনিসে পরিণত হয়।

কেউ কেউ আবার সখ করে বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করে। সখে সখে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। এরপর জিনিসটা যতবারই দেখে আনন্দ লাগে। খুশিতে মনটা আপ্লুত হয়ে যায়।

সখের সেই জিনিস কেউ হারাতে চায় না। প্রিয় জিনিস কেউ ফেলে দিতে চায় না। পছন্দের জিনিস কাউকে দিয়ে দিতেও গায়ে লাগে। মনটা খচ্‌খচ্‌ করে।

এটাই মানুষের স্বভাব।

হযত আবূ তালহা আনসারী (রা) মদীনার একজন ধনী মানুষ। তাঁর অনেক জায়গা জমি।

তাঁর বাগান ছিলো অনেকগুলির খেজুর গাছের বাগান। বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার বাগান।

বাগনগুলোতে মাঝে মাঝেই তিনি যেতেন। ঘুরে বেড়াতেন বাগানে বাগানে। গাছপালা দেখতেন। ফুল-ফসলে খবর নিতেন।

তাঁর একটি বাগানের নাম বায়রোহা। বায়রোহা বাগানটি বেশ নামকরা। মসজিদে নববীর কাছেই এই বাগান। বাগানে একটি কূপ ছিলো বড় সুন্দর। কূপটিকেও বলা হতো বায়রোহা কূপ। এই কূপের পানি ছিলো খুবই মিষ্টি।

স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মাঝে বায়রোহা বাগানে হাঁটতে যেতেন। বায়রোহা কূপ থেকে পানি উঠিয়ে পান করতেন।

আবূ তালহা আনসারী (রা) এতে দারুণ পুলকিত হতেন। তাঁর বুকের মধ্যে যেন সুখের পায়রা ডানা ঝাপটাতে থাকতো। তিনি নিজেকে দারুণ সৌভাগ্যবান মনে করতেন। তাঁর একটি বাগানে রসূলুল্লাহ (সা) তশরীফ আনেন। কূপের মিষ্টি পানি পান করে তৃপ্ত হন। এ কী কম সৌভাগ্যের কথা

বায়রোহা বাগানের প্রতি এভাবেই ধীরে ধীরে তাঁর মায়া জমতে থাকে। বাগানটি প্রিয় হয়ে উঠে। তাঁর অনেকগুলি বাগান। প্রতিটি বাগানেই ফলের গাছ ছায়াদার গাছ। প্রতিটি বাগানের দৃশ্যই সুন্দর। কিন্তু বায়রোহার সাথে যেন কোনটারই তুলনা হয় না।

আবূ তালহা (রা)-এর কাছে বায়রোহার মত প্রিয় আর কোন বস্তুই নেই। বায়রোহা হলো তাঁর প্রিয় বাগান। প্রিয় জিনিস। প্রিয় বস্তু

বায়রোহা বাগানে এলেই তাঁর মনে খুশি ছড়িয়ে পড়ে। বাগানটিতে মাঝে মাঝেই তিনি এসে বিশ্রাম করেন। এরই মধ্যে একদিন কুরআন পাকের আয়াত নাযিল হলো। সেই আয়াত শুনে আবূ তালহা (রা) ভিতরে ভিতরে চমকে উঠরেন। ভিতরে ভিতরে দমে গেলেন।

আয়াতটির অর্থ হলো-তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই পূর্ণ সওয়াব লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো, তা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করো।

আবূ তালহা (রা) আয়াতটি ভালোভাবে পাঠ করলেন। আয়াতের মর্মটাও বুঝতে পারলেন। তাঁর ভিতরের অপ্রসন্নতা ধীরে ধীরে কেটে গেলো। মনে মনে তিনি কঠিনভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

রসূলুলাহ (সা)–এর মুখোমুখি হাযির হলেন আবূ তালহা (রা)। আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠে তিনি আরয করলেন–ইয়া রসূলাল্লাহ! বায়রোহা নামের বাগানটিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার হুকুম পবিত্র কুরআনে এসেছে। তাই বায়রোহা বাগানটি আমি আল্লাহ্‌র পথে দান করে দিচ্ছি।

হযরত আপনি বাগানটি গ্রহণ করুন। আপনার ইচ্ছামত আপনি বাগানটি ব্যয় করুন।'

রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে খুশির উজ্জ্বলতা ফুটে উঠলো। নীরব আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো নবীজীর সারা মুখে। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন-বড় সুন্দর কথা বলেছো তুমি। প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেছো। তবে আমি চাই তুমি এই বাগানটি তোমার আত্মীয়-স্বজনের মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে দাও। আত্মীয়দের মাঝে দান করাটাও তো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাই হয়।

আবূ তালহা (রা) তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাগান প্রিয় বস্তুটি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। আল্লাহ্‌র পথে দান করে দিলেন।

এক মশক পানি

ইয়ারমুকের যুদ্ধ। যুদ্ধের ময়দানে বীরদর্পে লড়ছেন সাহাবীগণ। আল্লাহ্‌র দ্বীনের আওয়াজ ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জিহাদ। জীবনের সব স্বপ্ন উজাড় করে দিয়ে সবাই যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

শত্রুর আঘাতে কেউ কেউ আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। ক্ষত বিক্ষত হয়ে আর্তনাদ করছেন। কেউ কেউ শহীদ হয়ে গেছেন এরই মধ্যে।

চারদিকে রক্ত। চারদিকে লাশ। চারদিকে মুমূর্ষু সাহাবীগণের চিৎকার। যুদ্ধের ময়দান। জীবিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা প্রাণপণে লড়াই করে যাচ্ছেন। মুমূর্ষু সাহাবীগণের দিকে কেউ নজর দিতে পারছেন না।

রক্তহীম করা এক পরিবেশ।

এমনই সময় একজন ময়দানে এলেন। তাঁর হাতে পানি ভর্তি একটি মশক। রক্তাক্ত সাহাবী গণের মাঝে তিনি একজনকে খুঁজে চলেছেন। পানির পাত্রটি হাতে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছেন।

এই আগন্তুকের নাম আবু জহম ইবনে হুযাইফা (রাঃ)। এই জিহাদে তাঁরই এক চাচাতো ভাই যোগ দিয়েছেন। আহতদের মাঝে তিনি তাঁকেই খুঁজছেন। মশক ভরে পানি নিয়ে এসেছেন। যদি তাঁকে পাওয়া যায়! যদি অন্তিম সময়ে এক ফোঁটা পানি তাঁর মুখে তুলে দেয়া যায়! এই ইচ্ছায় তিনি ময়দানে এসেছেন।

ছুটতে ছুটতে আবু জহম (রাঃ) থেমে পড়লেন। দেখলেন তাঁর চাচাতো ভাইটি রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। আবু জহম (রাঃ) এর বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগলো। মৃত্যুর দোরগোড়ায় ভাইকে দেখে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন।

মুমূর্ষু ভায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে আবু জহম (রা) বললেন তোমাকে একটু পানি দেবো ভাই? মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর আবু জহম (রাঃ)-এর ভাই। কোনভাবে মাথা কাত করে সম্মতি জানালেন।

আবু জহম (রাঃ) দ্রুত মশকটি কাত করে ধরলেন। তাঁর ভায়ের মুখে তিনি পানি তুলে দিবেন। কাছ থেকে আরেকটি আর্তনাদ ভেসে এলোঃ আহ্! আহ্!!

আবু জহম (রাঃ) চাচাতো ভায়ের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, তিনি পানির মশকটি অপরজনের কাছে নিয়ে যেতে ইশারা করছেন। নিজে পানি পান না করে অপরজন কে পানি এগিয়ে দিতে বলছেন।

ভ্রাতৃত্বের ঋণে আবদ্ধ মন। বড়ই কোমল সে মন। আবু জহম (রাঃ) তাঁর কোমল মন নিয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন। একী আশ্চর্য! শহীদ হয়ে যাচ্ছেন ভাই। তাঁর জন্য তিনি পাত্র উপুর করে ধরেছেন। তাঁকে পানি পান করাবেন। মুমূর্ষু ভাইটি বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। অথচ সেই ভাই-ই কিনা আর একজনের মুখে পানি তুলে দিতে বলছেন! আবু জহম (রাঃ) এখন কী করবেন?

আত্মত্যাগের এক দুনিয়া মাতানো স্রোতে যেন ভেসে চলেছেন আবু জহম (রাঃ)।

একছুটে আবু জহম (রাঃ) অপর আহত মুজাহিদের কাছে এসে হাজির হলেন। তাঁর মুখে সেই পানি তুলে দিতে যাবেন, অমনি পাশ থেকে ভেসে এলো মুমূর্ষু তৃতীয় আরেক ব্যক্তির চিৎকার আহ্! আহ্!!

আবু জহম (রাঃ)-এবার দেখলেন, তিনি এইমাত্র যাঁর মুখে পানি তুলে দিতে এসেছেন সেই মৃত্যুপথ যাত্রী সাহাবী-ই তাকে তৃতীয়জনের মুখে পানি তুলে দিতে ইশারা করছেন।

আবু জহম (রাঃ) ভিতরে ভিতরে থমকে গেলেন। বিস্মিত হলেন। আহত মানুষ। ক্ষত-বিক্ষত মানুষ। রক্তাক্ত মানুষ। এঁদের প্রত্যেকেরই

এখন ভীষণ তৃষ্ণা। একটু পানি গিলতে পারলে এঁদের বড় উপকার হয়। বড় শান্তি হয়। অথচ এঁরা নিজের কষ্টটা দূর করার আগে আরেকজনের কষ্ট দূর করতে চাচ্ছেন। কেউ আগে মুখে পানি তুলতে চাচ্ছেন না।

আবু জহম (রাঃ) দৌড়াতে দৌড়াতে তৃতীয়জনের কাছে গেলেন। গিয়েই চমকে গেলেন। তৃতীয়জন আর জীবিত নেই। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। আবু জহম (রাঃ) এর মনে কষ্ট লাগলো। আহা! আহত একজন মুজাহিদের মুখে তিনি পানি তুলে দিতে পারলেন না।

আবু জহম (রাঃ) এবার ঘুরে দ্বিতীয়জনের দিকে ছুটতে লাগলেন। দ্বিতীয়জনের কাছে এসে আরো চমকে গেলেন। দ্বিতীয়জনও জীবিত নেই। আবু জহম (রাঃ)-এর মনের কষ্টটা বেড়ে গেলো।

শেষ পর্যন্ত আবু জহম (রাঃ) ঘুরতে ঘুরতে তাঁর ভায়ের কাছে এসে হাজির হলেন।

সাড়া শব্দ নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। নিথর দেহটি পড়ে আছে। আবু জহম (রাঃ) তাঁর ভাইকেও পানি পান করাতে পারলেন না। তাঁর প্রিয় চাচাতো ভাইটিও শহীদ হয়ে পরপারে চলে গেছেন।

কষ্টে কষ্টে আবু জহম (রাঃ)-এর বুকটা যেন ছারখার হয়ে গেলো।

ইয়ারমুকের বালুকাময় প্রান্তর। উপরে এক বিশাল আকাশ। দূরে পাহাড়ের টিলা-টক্কা।

আবু জহম (রাঃ) এই প্রান্তরে বিষণ্ন মনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মরণজয়ী তিন সাহাবীর আত্মত্যাগের দৃশ্যটি তখনো তাঁর সামনে। পানিভর্তি একটি মশক নিয়ে তিনি তাঁদের কিছুই করতে পারলেন না।